স্বামি শিষ্য সংবাদ

(উত্তর কাণ্ড)

অষ্টম সংস্করণ

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বত্ব সংরক্ষিত

দুই টাকা

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

১৩৫৩

প্রিন্টার—[illegible]গেন্দ্রনাথ
বোস প্রেস
৩০ নং, ব্রজনাথ মিত্র
কলিকাতা

নিবেদন

গত সাত বৎসর যাবৎ "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" উদ্বোধন পত্রে ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিনে পুস্তকাকারে উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত হইল।

স্বামিজী যখন প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা বাগবাজার ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করেন, তখন হইতে শিষ্যের সহিত স্বামিজীর নানারূপ বিচার ও শাস্ত্রপ্রসঙ্গ হইত। পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐ সময়ে একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি শিষ্যকে বলেন যে, স্বামিজীর সহিত যে সব প্রসঙ্গ হয়, তাহা যেন সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে শিষ্য সেই সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাতেই বিস্তৃত আকারে "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, বেলুড়মঠের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলানন্দ স্বামী মহারাজও এই সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিষ্যকে বহুধা উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের নিকট শিষ্য এই জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ডায়েরী হইতে লিখিত হইয়াছে। যেখানে স্মৃতি হইতে লেখা হইয়াছে, সেই সকল স্থান স্বামিজীর গুরুভ্রাতৃগণ ও শিষ্যবর্গকে (যাঁহাদের সম্মুখে প্রসঙ্গোক্ত বিষয় সকল স্বামিজী ঐ ভাবে বলিয়াছিলেন) দেখাইয়া, তাঁহাদের দ্বারা প্রসঙ্গের সত্যতা পরীক্ষা করাইয়া ছাপান হইয়াছে। সুতরাং

এই সকল প্রসঙ্গে কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ আছে বলিয়া শিষ্যের নাই। এই প্রসঙ্গের পঠন-পাঠন দ্বারা যদি কাহারও কল্যাণ হয়, তবেই শিষ্য আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদের' সমং (entire right) শিষ্য বেলুড়-মঠের ট্রাষ্টি-(Trustee) দান করিয়াছে। ইহার সমগ্র আয় স্বামিজীর সমাধিমা ব্যয়সঙ্কুলানে ব্যয়িত হইবে; এবং অতঃপর যাহা উদ্বৃত্ত থ তাহা রামকৃষ্ণ-মঠের সেবাকল্পে ব্যয়িত হইবে। গ্র প্রকাশিত হইলে, ইহার উত্তরোত্তর সমগ্র সংস্করণে শি সংসারসম্পর্কে শিষ্যের দায়াদগণের কোনরূপ দাবী থাকিল থাকিবে না। ইতি—

গ্রন্থকা

মাঘ, ১৩১৯

সূচীপত্র

উত্তর কাণ্ড—কাল, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

প্রথম বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—ভারতের উন্নতির উপায় কি?—পরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মযোগ। পৃষ্ঠা—১

দ্বিতীয় বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—জ্ঞানযোগ ও নির্ব্বিকল্প সমাধি—অভীঃ—সকলেই একদিন ব্রহ্মবস্তু লাভ করিবে। পৃষ্ঠা—৮

তৃতীয় বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)।

বিষয়—'শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক'—পূর্ণপ্রজ্ঞ না হইলে প্রেমানুভূতি অসম্ভব—যথার্থ জ্ঞান বা ভক্তি যতক্ষণ লাভ হয় নাই, ততক্ষণই বিবাদ—ধর্ম্মরাজ্যে বর্ত্তমান ভারতে কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য—শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর ও গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের পূজার প্রচলন করা আবশ্যক—অবতার মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-কারণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য। পৃষ্ঠা—১৬

চতুর্থ বল্লী—স্থান বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করা

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজন—কৃপাসিদ্ধ কাহাকে বলে—দেশকালনিমিত্তের অতীত রাজ্যে কে কাহাকে কৃপা করিবে। পৃষ্ঠা—২৪

পঞ্চম বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—খাদ্যাখাদ্যের বিচার কি ভাবে করিতে হইবে—আমিষ আহার কাহার করা কর্ত্তব্য—ভারতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের কি ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন। পৃষ্ঠা—৩০

ষষ্ঠ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—ভারতের দুর্দ্দশার কারণ, উহা দূরীকরণের উপায়—বৈদিক ছাঁচে দেশটাকে পুনরায় গড়িয়া তোলা এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ন্যায় মানুষ তৈয়ারী করা। পৃষ্ঠা—৩৮

সপ্তম বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্থান-কালাদির শুদ্ধতা বিচার কতক্ষণ—আত্মার প্রকাশের অন্তরায় যাহা নাশ করে, তাহাই সাধনা—"ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের লেশমাত্র নাই" শাস্ত্রবাক্যের অর্থ—নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে—কর্ম্মের দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না তথাপি স্বামিজী দেশের লোককে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন কেন?—ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সুনিশ্চিত। পৃষ্ঠা—৪৬

অষ্টম বল্লী—স্থান বেলুড়-মঠ (নির্ম্মাণকালে)। বর্ষ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার কঠোর নিয়ম—সাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকেই ঠাকুরের ভাব লইতে পারিবে—শুধু ধ্যানাদিতে

নিযুক্ত থাকাই এ যুগের ধর্ম্ম নহে, এখন চাই উহার সহিত গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। পৃষ্ঠা—৫৫

নবম বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে।

বিষয়—স্বামিজীর নাগ মহাশয়ের সহিত মিলন—পরস্পরের সম্বন্ধে উভয়ের উচ্চ ধারণা। পৃষ্ঠা—৬০

দশম বল্লী—স্থান বেলুড়-মঠ।

বিষয়—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া ও জীবের স্বরূপ—সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া ঈশ্বরকে ধারণা করিয়া, সাধনায় অগ্রসর হইয়া ক্রমে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে—'অহং ব্রহ্ম' এইরূপ বোধ না হইলে মুক্তি নাই—কামকাঞ্চনভোগস্পৃহা ত্যাগ না হইলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ না হইলে উহা হয় না—অন্তর্ব্বহিঃ-সন্ন্যাসে আত্মজ্ঞানলাভ—'মেদাটে ভাব' ত্যাগ করা—কিরূপ চিন্তায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়—মনের স্বরূপ ও মনঃসংযম কিরূপে করিতে হয়—জ্ঞানপথের পথিক আপনার যথার্থ স্বরূপকেই ধ্যানের বিষয়রূপে অবলম্বন করিবে—অদ্বৈতাবস্থা লাভে অনুভব—জ্ঞান, ভক্তি, যোগরূপ সকল পথের লক্ষ্যই জীবকে ব্রহ্মজ্ঞ করা—অবতার-তত্ত্ব—'আত্মজ্ঞান' লাভে উৎসাহ প্রদান—আত্মজ্ঞ পুরুষের কর্ম্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়। পৃষ্ঠা—৬৬

একাদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামিজীর কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ দাস গুপ্তের সহিত শিল্প সম্বন্ধে কথোপকথন—কৃত্রিম পদার্থ-নিচয়ে মনোভাব প্রকাশ করাই শিল্পের লক্ষ্য হওয়া উচিত—ভারতের বৌদ্ধ যুগের শিল্প

ঐ বিষয়ে জগতে শীর্ষ-স্থানীয়—ফটোগ্রাফের সহায়তা লাভ করিয়া ইউরোপী শিল্পের ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে অবনতি—ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পে বিশেষত্ব আছে—জড়বাদী ইউরোপ ও অধ্যাত্মবাদী ভারতের শিল্পে কি বিশেষত্ব আছে—বর্ত্তমান ভারতে শিল্পাবনতি—দেশের সকল বিদ্যা ও ভাবের ভিতরে প্রাণসঞ্চার করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমন। পৃষ্ঠা—৭৯

দ্বাদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামিজীর শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিসঞ্চার—পূর্ব্ব-বঙ্গের কথা—নাগ মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্য-স্বীকার আচার ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা—কামকাঞ্চনাসক্তি-ত্যাগে আত্মদর্শন। পৃষ্ঠা—৮৯

ত্রয়োদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামিজীর মনঃসংযম—তাঁহার স্ত্রী-মঠ-স্থাপনের সঙ্কল্প সম্বন্ধে শিষ্যকে বলা—এক চিৎসত্তা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান—প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোকদিগের শাস্ত্রাধিকার কতদূর ছিল—স্ত্রীজাতির সম্মাননা ভিন্ন কোন দেশ বা জাতির উন্নতিলাভ অসম্ভব—তন্ত্রোক্ত বামাচারের দূষিত ভাবই বর্জ্জনীয়; নতুবা স্ত্রীজাতির সম্মাননা ও পূজা প্রশস্ত ও অনুষ্ঠেয়—ভাবী স্ত্রী-মঠের নিয়মাবলী—ঐ মঠে শিক্ষিতা [illegible]চারিণীদের দ্বারা সমাজের কিরূপ প্রভূত কল্যাণ হইবে—পরব্রহ্মে লিঙ্গভেদ নাই; উহা কেবল 'আমি তুমি'র রাজ্যে বিদ্যমান—অতএব স্ত্রীজাতির ব্রহ্মজ্ঞা হওয়া অসম্ভব নহে—বর্ত্তমানে-

প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় অনেক ত্রুটি থাকিলেও উহা নিন্দনীয় নহে—ধর্ম্মকে শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে—মানবের ভিতর ব্রহ্মবিকাশের সহায়কারী কার্য্যই সৎকার্য্য—বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের অত্যন্ত অভাব থাকিলেও তল্লাভে কর্ম্ম গৌণভাবে সহায়ক হয়, কারণ, কর্ম্ম দ্বারাই মানবের চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না। পৃষ্ঠা—৯৯

চতুর্দ্দশ বল্লী—স্থান—বেলুড় মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামিজীর ইন্দ্রিয়-সংযম, শিষ্যপ্রেম, রন্ধনকুশলতা ও অসাধারণ মেধা—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে তাঁহার মতামত। পৃষ্ঠা—১১৩

পঞ্চদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—আত্মা অতি নিকটে রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার অনুভূতি সহজে হয় না কেন—অজ্ঞানাবস্থা দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হইলে জীবের মনে নানা সন্দেহ প্রশ্নাদি আর উঠে না—স্বামিজীর ধ্যানতন্ময়তা পৃষ্ঠা—১২১

ষোড়শ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া স্বামিজীর চিত্তে অবসাদ—বর্ত্তমান কালে দেশে কিরূপ আদর্শের আদর হওয়া কল্যাণকর—মহাবীরের আদর্শ—দেশে বীরের কঠোর-প্রাণতার উপযোগী সকল বিষয়ের আদর প্রচলন করিতে হইবে—সকল প্রকার দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিতে হইবে—স্বামিজীর বাক্যের অদ্ভুত শক্তির দৃষ্টান্ত—লোককে শিক্ষা দিবার জন্য শিষ্যকে

উৎসাহিত করা—'সকলের মুক্তি না হইলে ব্যষ্টির মু
নাই' মতের আলোচনা ও প্রতিবাদ—ধারাবাহিক কল্যা
চিন্তা দ্বারা জগতের কল্যাণ করা। পৃষ্ঠা—১

সপ্তদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—মঠ সম্বন্ধে নৈষ্ঠিক হিন্দুদিগেব পূর্ব্ব-ধারণা—মঠে ৺দুর্গো
সব এবং ঐ ধারণার নিবৃত্তি—নিজ জননীর সহি
স্বামিজীর ৺কালীঘাট দর্শন ও ঐ স্থানের উদারভাব সম্ব
মতপ্রকাশ—স্বামিজীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেব-দেবী
পূজা করাটা ভাবিবার বিষয়—মহাপুরুষ ধর্ম্মরক্ষা
নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রহ করেন—দেবদেবীর পূজা অকর্ত্তব
বিবেচনা করিলে স্বামিজী কখনই ঐরূপ করিতেন না—
স্বামিজীর ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এ যুগে
আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে
অগ্রসর হইলেই দেশের ও জীবের ধ্রুব কল্যাণ।
পৃষ্ঠা—১৩৯

অষ্টাদশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—ঠাকুরের জন্মোৎসব ভবিষ্যতে কি ভাবে হইলে ভাল হয়—
শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ 'যখন এখানে এসেছিস, তখন নিশ্চয়
জ্ঞানলাভ হবে'—গুরু শিষ্যকে কতকটা সাহায্য করিতে
পারেন—অবতার পুরুষেরা এক দণ্ডে জীবের সমস্ত বন্ধন
ঘুচাইয়া দিতে সক্ষম—কৃপা—শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরকে
দেখা—পওহারী বাবা ও স্বামিজী-সংবাদ। পৃষ্ঠা—১৫০

উনবিংশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামিজী শেষ জীবনে কি ভাবে মঠে থাকিতেন—তাঁহার

দরিদ্র-নারায়ণ সেবা—দেশের গরীব দুঃখীর প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত সহানুভূতি। পৃষ্ঠা—১৬০

বিংশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টাব্দ (প্রারম্ভ)।
বিষয়—বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের সাধন ভজন—মঠের প্রথমাবস্থা—স্বামিজীর জীবনের কয়েকটি দুঃখের দিন—সন্ন্যাসের কঠোর শাসন।

পৃষ্ঠা—১৬৭

একবিংশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টাব্দ।
বিষয়—বেলুড় মঠে ধ্যানজপানুষ্ঠান—বিদ্যারূপিণী কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণে আত্মদর্শন—ধ্যানকালে একাগ্র হইবার উপায়—মনের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প অবস্থা—কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণের উপায়—ভাব-সাধনার পথে বিপদ—কীর্ত্তনাদির পরে অনেকের পাশব-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি কেন হয়—কিরূপে ধ্যানারম্ভ করিবে—ধ্যানাদির সহিত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ।

পৃষ্ঠা—১৭৩

দ্বাবিংশ বল্লী—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টাব্দ।
বিষয়—মঠে কঠোর বিধি-নিয়মের প্রচলন—'আত্মারামের কৌটা' ও উহার শক্তি পরীক্ষা—স্বামিজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে শিষ্যের প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত কথোপকথন—পূর্ব্ববঙ্গে অদ্বৈতবাদ বিস্তার করিতে স্বামিজীর শিষ্যকে উৎসাহিত করা, এবং বিবাহিত হইলেও, ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া তাহাকে অভয়-দান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গসম্বন্ধে স্বামিজীর বিশ্বাস—নাগমহাশয়ের সিদ্ধসঙ্কল্পত্ব। পৃষ্ঠা—১৭৯

ত্রয়োবিংশ বল্লী—স্থান—কলিকাতা হইতে মঠে নৌকাযোগে। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—স্বামিজীর নিরভিমানিতা—কামকাঞ্চনের সেবাত্যাগ না করিলে ঠাকুরকে ঠিকঠিক বুঝা অসম্ভব—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত কাহারা—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভক্তেরাই সর্ব্বকাল জগতে অবতার মহাপুরুষদিগের ভাব প্রচার করিয়াছেন—গৃহী ভক্তেরা ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাও আংশিকভাবে সত্য—মহান্ ঠাকুরের এক বিন্দু ভাব ধারণ করিতে পারিলে মানুষ ধন্য হয়—সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে ঠাকুরের বিশেষভাবে উপদেশ দান—কালে সমগ্র পৃথিবী ঠাকুরের উদার ভাব গ্রহণ করিবে—ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সাধুদের সেবা, বন্দনা মানবের কল্যাণকর।

পৃষ্ঠা—১৮৮

চতুর্ব্বিংশ বল্লী—শেষ দেখা—স্থান—বেলুড়-মঠ। বর্ষ—১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

বিষয়—জাতীয় আহার, পোষাক ও আচার পরিত্যাগ দূষণীয় —বিদ্যা সকলের নিকট হইতে শিখিতে পারা যায়, কিন্তু যে বিদ্যাশিক্ষায় জাতীয়ত্ব লোপ হয়, তাহার সর্ব্বথা পরিহার কর্ত্তব্য—পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শিষ্যের সহিত কথোপকথন—স্বামিজীর নিকট শিষ্যের ধ্যানৈকাগ্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা—স্বামিজীর শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করা—বিদায়।

পৃষ্ঠা—১৯৭

স্বামি-শিষ্য সংবাদ

(উত্তর কাণ্ড)

প্রথম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

ভারতের উন্নতির উপায় কি ?

পরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মযোগ

শিষ্য। স্বামিজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন? বক্তৃতা-প্রভাবে ইউরোপ আমেরিকা মাতাইয়া আসিলেন; কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আপনার ঐ বিষয়ে উদ্যম ও অনুরাগ যে কেন কমিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশসকলের অপেক্ষা এখানেই আমাদিগের বিবেচনায়, ঐরূপ উদ্যমের অধিক প্রয়োজন।

স্বামিজী। এদেশে আগে Ground (জমি) তৈরী করতে হবে। তবে বীজ ফেল্‌লে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের মাটীই এখন বীজ ফেল্‌বার উপযুক্ত, খুব উর্ব্বরা। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে

তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না। একটা দারুণ অভাব বোধ কর্‌ছে। তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা কতকটা তৃপ্ত হলে, তবে লোকে যোগের কথা শোনে ও বোঝে। অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগ-শোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্‌চার ফেক্‌চার দিয়ে কি হবে?

শিষ্য। কেন, আপনিই ত কখন কখন বলিয়াছেন, এদেশ ধর্ম্ম-ভূমি! এদেশে লোকে যেমন ধর্ম্মকথা বুঝে ও কার্য্যতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, অন্যদেশে সেরূপ নহে। তবে আপনার জ্বলন্ত বাগ্মিতায় কেন না দেশ মাতিয়া উঠিবে—কেন না ফল হইবে?

স্বামিজী। ওরে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে গেলে, আগে কূর্ম্মাবতারের পূজা চাই; পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না কল্লে, তোর ধর্ম্মকর্ম্মের কথা কেউ নেবে না। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির! বিদেশীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সর্ব্বাপেক্ষা তোদের পরস্পরের ভিতর ঘৃণিত দাসসুলভ ঈর্ষাই তোদের দেশের অস্থি মজ্জা খেয়ে ফেলেছে। ধর্ম্মকথা শুনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর কর্‌তে হবে। নতুবা শুধু লেক্‌চার্‌ ফেক্‌চারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

শিষ্য। তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন?

স্বামিজী। প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌তে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরী কচ্ছি। শিক্ষা শেষ হলে, এরা দ্বারেদ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিরূপে হতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, আর, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের মহান্‌ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের Mass of People (জন-সাধারণ) যেন একটা Sleeping Leviathan (একটা বিরাট জানোয়ার, ঘুমিয়ে রয়েছে)! এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড় জোর একজন কি দুইজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠ্‌তে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে, সে সাত ছেলের বাপ্‌! তখন যা তা করে একটা কেরানীগিরি, বড় জোর একটা ডেপুটীগিরি জুটিয়ে নেয়। ওই হল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না,—পরার্থে সে আবার কি কর্‌বে?

শিষ্য। তবে কি আমাদের উপায় নাই?

স্বামিজী। অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্ম্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠ্‌বে। এমন উঠ্‌বে যে জগৎ দেখে অবাক্ হয়ে যাবে। দেখিস নি?—নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, ঢেউটা তারপর তত জোরে ওঠে—এখানেও সেইরূপ হবে। দেখ্‌ছিস্ না, পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য্য ওঠবার আর বিলম্ব নেই। তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশেদেশে গাঁয়েগাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাক্‌লে চলছে না! শিক্ষাহীন, ধর্ম্মহীন বর্ত্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌গে—"ভাই সব ওঠ, জাগ, কত দিন আর ঘুমুবে?" আর, শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মটা একচেটে করে বসে ছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিক্‌লো না, তখন সেই ধর্ম্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা কর্‌গে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের ন্যায় তোমাদেরও ধর্ম্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ-জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখা পড়াকেও ধিক্—আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক্!

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে, নিজেও ধন্য হইতাম, অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম।

স্বামিজী। দূর মূর্খ! শক্তি ফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা আপনি বেরিয়ে পড়্‌বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখ্‌বি এত শক্তি আস্‌বে যে সামলাতে পারবি নি। পরার্থে এতটুকু কাজ কর্‌লে ভিতরের শক্তি জেগে ওঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাব্‌লে, ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি; কিন্তু ইচ্ছা হয় তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুসী হই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কি হইবে?

স্বামিজী। তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস্‌, ত ভগবান তাদের একটা উপায় কর্‌বেনই কর্‌বেন। "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি," গীতায় পড়েছিস্‌ ত?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামিজী। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে—সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস্‌, সকলকে সমান-ভাবে দেখ্‌তে হবে; তবে একটি স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী আপনার বলে ভাব্‌বি কেন? তোর

দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙ্গাল বেশে এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন! তাঁকে কিছু না দিয়ে, খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্ব্য চোষ্য দিয়ে পূর্ত্তি করা—সে ত পশুর কাজ।

শিষ্য। মহাশয়, পরার্থে কার্য্য করিতে সময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। তাহা কোথায় পাইব?

স্বামিজী। বলি, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর্ না। পয়সার অভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিস্—একটা মিষ্টি কথা বা দুটো সৎ উপদেশও ত তাদের শোনাতে পারিস্! না—তাতেও তোর টাকার দরকার?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা পারি।

স্বামিজী। 'হাঁ পারি' কেবল মুখে বল্লে হচ্ছে না। কি পারিস্—তা কাজে আমায় দেখা, তবেত জান্‌ব—আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা—কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ পাথরও ত হচ্ছে মর্‌ছে—ঐরূপ জন্মাতে মর্‌তে মানুষের কখন ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—"তোমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোল।" নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে?—মুক্তি কামনাও ত মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। স্বামিজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরী কর্‌গে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা কর্‌তে নরলোকে শরীর ধারণ কর্‌বে ; তার জন্য ভাবনা নেই। এই দেখ্‌না, আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যদিগের) ভিতরে যারা আগে ভাবতো—তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুল্‌ছে! দেখ্‌ছিস না—নিবেদিতা, ইংরেজের মেয়ে হয়েও, তোদের সেবা কর্‌তে শিখেছে? আর তোরা তোদের নিজের দেশের লোকের জন্য তা কর্‌তে পার্‌বিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে। নয়—মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে ত যাবিই ; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল! এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা ভরসা। তোদের কর্ম্মহীন দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরি করিস্ নি—মৃত্যু ত দিন দিন নিকটে আস্‌ছে! পরে কর্‌বি বলে আর বসে থাকিস্‌নি—তা হলে কিছুই হবে না।

দ্বিতীয় বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

জ্ঞানযোগ ও নির্ব্বিকল্প সমাধি—অভীঃ—
সকলেই একদিন ব্রহ্মবস্তু লাভ করিবে

শিষ্য। স্বামিজী, ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন তবে জগতে এত বিচিত্রতা দেখা যায় কেন ?

স্বামিজী। ব্রহ্ম বস্তুকে (সত্যই হন বা আর যাই হন) কে জানে বল্ ? জগৎটাকেই আমরা দেখি ও সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে থাকি। তবে সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করে বিচারপথে অগ্রসর হলে কালে একত্বমূলে পৌঁছান যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত হতে পার্‌তিস্, তা হলে এই বিচিত্রতাটা দেখ্‌তে পেতিস্ না।

শিষ্য। মহাশয়, যদি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই প্রশ্নই বা কেন করিব ? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই যখন প্রশ্ন করিতেছি, তখন উহাকে সত্য বলিয়া অবশ্য মানিয়া লইতেছি।

স্বামিজী। বেশ কথা। সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে, উহাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে, একত্বের মূলানুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে

ব্যতিরেকী বিচার বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্তু বলে ধরে নিয়ে, বিচার করে দেখান যে, সেটা ভাব নয়, অভাব বস্তু। তুই ঐরূপে মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে সত্যে পৌঁছানর কথা বল্‌ছিস্‌—কেমন ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, তবে আমি ভাবকেই সত্য বলি এবং ভাব-রাহিত্যটাকেই মিথ্যা বলে স্বীকার করি।

স্বামিজী। আচ্ছা। এখন দেখ্‌, বেদ বল্‌ছে—একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। যদি বস্তুতঃ এক ব্রহ্মই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব ত মিথ্যা হচ্ছে ; বেদ মানিস্‌ ত ?

শিষ্য। বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু যদি কেহ না মানে তাহাকেও ত নিরস্ত করিতে হইবে ?

স্বামিজী। তাও হয়। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ করে বুঝিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমরা বিশ্বাস কর্‌তে পারি না ; ইন্দ্রিয়সকলও ভুল সাক্ষ্য দেয় ; এবং যথার্থ সত্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বল্‌তে হয়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। উহাকেই ঋষিরা যোগ বলেছেন। যোগ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ—উহা হাতে নাতে কর্‌তে হয়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, করলেই ফল পাওয়া যায়। করে দেখ্‌—হয়, কি না হয়। আমি বাস্তবিকই দেখেছি, ঋষিরা যা বলেছেন সব সত্য ! এই দেখ্‌, তুই যাকে বিচিত্রতা বল্‌ছিস্‌, তা এক সময় লুপ্ত

হয়ে যায়, অনুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের কৃপায় প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য। কখন্ ঐরূপ করিয়াছেন?

স্বামিজী। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; দেবামাত্র দেখলুম, ঘরবাড়ী, দোর দালান, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য্য—সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে গেল—তারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই; তবে মনে আছে, ঐরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল—চীৎকার করে ঠাকুরকে বলেছিলুম, 'ওগো তুমি আমার কি কর্‌চ গো, আমার যে বাপ, মা আছে!'—ঠাকুর তাতে হাস্‌তে হাস্‌তে 'তবে এখন থাক' বলে ফের ছুঁয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম—ঘরবাড়ী, দোর, দালান—যা যেমন সব ছিল, ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন—আমেরিকার একটি lakeএর (হ্রদের) ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। কিয়ৎ পরে বলিল—আচ্ছা মহাশয়, ঐরূপ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকারেও ত হতে পারে? আর এক কথা, ঐ অবস্থাতে আপনার বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হয়েছিল কি?

স্বামিজী। যখন রোগের খেয়াল নয়, নেশা করে নয়, রকম-বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে মস্তিষ্কের বিকার কি

করে বল্‌বি? বিশেষতঃ যখন আবার ঐরূপ অবস্থা-লাভের কথা বেদের সঙ্গে মিল্‌ছে, পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্য ও ঋষিগণের আপ্তবাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমায় কি শেষে তুই বিকৃত মস্তিষ্ক ঠাওরালি?

শিষ্য। না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাস্ত্রে যখন শতশত এরূপ একত্বানুভূতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি যখন বলিতেছেন যে ইহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, আর আপনার অপরোক্ষানুভূতি যখন বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অবিসম্বাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—ক গতং কেন বা নীতং, ইত্যাদি।

স্বামিজী। জান্‌বি, এই একত্বজ্ঞান—যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মানুভূতি বলে—হলে জীবের আর ভয় থাকে না—জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ কর্‌তে পারে না। সেই পরমানন্দ পেলে, জগতের সুখদুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয়, এবং আমরা যদি যথার্থ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপই হই, তাহা হইলে ঐরূপে সমাধিতে সুখ-লাভে আমাদের যত্ন হয় না কেন? আমরা তুচ্ছ কাম-কাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছি কেন?

[স্ব]ামিজী। তুই মনে কচ্ছিস্, জীবের সে শান্তিলাভে আগ্রহ নেই বুঝি? একটু ভেবে দেখ্—বুঝতে পার্‌বি, যে যা

কচ্ছে, সে তা ভূমা সুখের আশাতেই কর্‌ছে। তবে সকলে ঐ কথা বুঝে উঠ্‌তে পারছে না। সে পরমানন্দ লাভের ইচ্ছা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে পূর্ণভাবে রয়েছে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্ত্তে ঠিক ঠিক ভাবলেই ঐ কথার অনুভূতি হয়। কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরী করে স্ত্রী-পুত্রের জন্য এত খাট্‌ছিস্‌, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। এই মোহের মারপেঁচে পড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে ক্রমশঃ স্বস্বরূপে নজর আস্‌বে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খাচ্ছিস্‌ ও খাবি। ঐরূপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়্‌বে ; সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জন্মে—কারও বা লক্ষ জন্মে।

শিষ্য। সে চৈতন্য হওয়া, মহাশয়, আপনার আশীর্ব্বাদ ও ঠাকুরের কৃপা না হইলে কখনও হইবে না।

স্বামিজী। ঠাকুরের কৃপা-বাতাস ত বইছেই। তুই পাল তুলে দেনা! যখন যা কর্‌বি, খুব একাত্মমনে কর্‌বি। দিনরাত ভাব্‌বি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমার আবার ভয় ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি সবই ক্ষণিক—এর পারে যা তাই আমি।

শিষ্য। ঐ ভাব ক্ষণিক আসিলেও আবার খনি উড়িয়া যায় ও ছাই ভস্ম সংসার ভাবি।

স্বামিজী। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে। ক্রমে শুধ্‌রে যাবে।

তবে মনের খুব তীব্রতা, ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাব্‌বি যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, আমি কি কখন অন্যায় কাজ কর্‌তে পারি? আমি কি সামান্য কাম-কাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের ন্যায় মুগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি করে জোর কর্‌বি। তবে ত ঠিক কল্যাণ হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ডেপুটিগিরির জন্য পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মজায় থাক্‌ব।

স্বামিজী। মনে যখন ওসব আস্‌বে, তখনি বিচার কর্‌বি। তুই ত বেদান্ত পড়েছিস্‌?—ঘুমুবার সময়ও বিচারের তরোয়াল-খানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোভ সাম্‌নে না এগুতে পারে। এইরূপে জোর করে বাসনা ত্যাগ কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আস্‌বে—তখন দেখ্‌বি, স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য। আচ্ছা স্বামিজী, ভক্তিশাস্ত্রে যে বলে, বেশী বৈরাগ্য হলে ভাব থাকে না?

স্বামিজী। আরে ফেলে দে তোর সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ওরকম কথা আছে। বৈরাগ্য! বিষয়বিতৃষ্ণা—না হলে, কাক-বিষ্ঠার ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না কর্‌লে, "ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি," ব্রহ্মার কোটীকল্পেও জীবের মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা, কেবল তীব্র বৈরাগ্য আন্‌বার জন্য। তা যার হয়নি, তার জান্‌বি,—

নোঙ্গর ফেলে নৌকোয় দাঁড় টানার মত হচ্ছে! "ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, কামকাঞ্চন ত্যাগ হইলেই কি সব হইল?

স্বামিজী। ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি! সেটা যে সে লোক সাম্‌লাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে। এই যে মঠ ফঠ কর্‌ছি, নানা রকমের পরার্থে কাজ করে সুখ্যাতি হচ্ছে—কে জানে, আমাকেই বা আবার ফিরে আস্‌তে হয়!

শিষ্য। মহাশয়, আপনিই ঐ কথা বলিতেছেন—তবে আমরা আর যাই কোথায়?

স্বামিজী। সংসারে রয়েছিস্, তাতে ভয় কি? "অভীরভীরভীঃ" —ভয় ত্যাগ কর্। নাগ মহাশয়কে দেখেছিস্ ত?— সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর বাড়া! এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। গেরস্ত যদি কেহ হয় ত, যেন নাগ মহাশয়ের মত হয়। নাগ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ আলো করে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বল্‌বি,—যেন তাঁর কাছে যায়। তা হলে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য। মহাশয়, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; নাগ মহাশয়কে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-সহচর জীবন্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়!

স্বামিজী। তা একবার বল্‌তে? আমি ওঁকে একবার দর্শন কর্‌তে যাব—তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন

মাঠ দেখতে আমার এক এক সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব। দেখ্‌ব। তুই তাঁকে লিখিস্‌।

শিষ্য। আমি লিখিয়া দিব। আপনার দেওভোগ যাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইবেন। বহুপূর্ব্বে আপনার একবার যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্ববঙ্গ আপনার চরণধূলিতে তীর্থ হয়ে যাবে।"

স্বামিজী। জানিস্‌ ত, নাগ মহাশয়কে ঠাকুর বল্‌তেন—'জ্বলন্ত আগুন'।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা শুনিয়াছি।

স্বামিজী। অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়—কিছু খেয়ে যা।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

অনন্তর কিছু প্রসাদ পাইয়া, শিষ্য কলিকাতা যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল—স্বামিজী কি অদ্ভুত পুরুষ!—যেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি আচার্য্য শঙ্কর!

তৃতীয় বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বিষয়

'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক'—পূর্ণপ্রজ্ঞ না হইলে প্রেমানুভূতি অসম্ভব—যথার্থ জ্ঞান বা ভক্তি যতক্ষণ লাভ হয় নাই, ততক্ষণই বিবাদ,—ধর্ম্মরাজ্যে বর্ত্তমান-ভারতে কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য—শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর ও গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলন করা আবশ্যক—অবতার মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-কারণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য।

শিষ্য। স্বামিজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? দেখিতে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাত দেন, আবার জ্ঞান-মার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ।

স্বামিজী। কি জানিস্, গৌণজ্ঞান ও গৌণভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্প শুনেছিস ত?*

* শিবরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম; সুতরাং যুদ্ধের পরে দুজনে ভাবও হইল। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেত-গুলির আর রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে ঝগড়া কিচকিচি সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মিটিল না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

স্বামিজী। কিন্তু মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে —ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্ব্বত্র সকলের ভিতরে ভগবানের প্রেমমূর্ত্তি দেখ্তে পাস্ ত কার উপর আর হিংসা দ্বেষ কর্‌বি? সেই প্রেমানুভূতি, এতটুকু বাসনা—বা ঠাকুর যাকে বলতেন কামকাঞ্চনাসক্তি—থাক্‌তে হবার যো নেই। সম্পূর্ণ প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্য্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্ব্বত্র একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্ব্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু অহংবুদ্ধি থাকৃতে হবার যো নেই।

শিষ্য। তবে আপনি যাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান?

স্বামিজী। তা বই কি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারও প্রেমানুভূতি হয় না। দেখ্‌ছিস্ ত বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে। ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে হচ্ছে—সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব; চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান; আর আনন্দ বা প্রেম। ভগবানের সৎ ভাবটি নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্য সত্তাটির উপরেই সর্ব্বদা বেশী ঝোঁক দেয়, আর ভক্তগণ আনন্দ সত্তাটিই সর্ব্বক্ষণ নজরে রাখে। কিন্তু চিৎস্বরূপ অনুভূতি হবামাত্র তখনি আনন্দস্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ, যাহা চিৎ তাহাই যে আনন্দ।

শিষ্য। তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন; এবং ভক্তি ও জ্ঞান-শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন?

স্বামিজী। কি জানিস্, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে মানুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ কর্‌তে অগ্রসর হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়? End (উদ্দেশ্য) বড়, কি means (উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য হতে উপায় কখন বড় হতে পারে না। কেন না, অধিকারি-ভেদে একই উদ্দেশ্য লাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখ্‌ছিস্ জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বি—বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বল্‌ছেন, পূবমুখো হয়ে বসে ভগবানকে ডাক্‌লে তবে তাঁকে পাওয়া যায়; আর এক জন বল্‌ছেন, না, পশ্চিমমুখো হয়ে বস্‌তে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয় ত একজন বহুকাল পূর্ব্বে পূবমুখো হয়ে বসে ধ্যান ভজন করে ঈশ্বরলাভ করে-ছিলেন; তাঁর চেলারা তাই দেখে অমনি ঐ মত চালিয়ে দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, পূবমুখো হয়ে না বস্‌লে ঈশ্বরলাভ কখনই হবে না। আর একদল বল্‌লে, সে কি কথা?—পশ্চিমমুখো বসে অমুক ভগবান্ লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে?—আমরা তোদের ঐ মত মানি

না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়ত হরিনাম জপ করে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত্র তৈরী হল, "নান্যেব গতিরন্যথা"। কেউ আবার আল্লা বলে সিদ্ধ হলেন, তখনি তার আর এক মত চল্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের এখন দেখতে হবে, এই সকল জপ, পূজাদির থেই (আরম্ভ) কোথায়? সে থেই হচ্ছে শ্রদ্ধা; সংস্কৃতভাষার 'শ্রদ্ধা' কথাটি বুঝাবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বল্‌লে সংস্কৃত শ্রদ্ধা কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে কোন তত্ত্ব হোক্ না, ভাব্‌তে থাকলেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অনুভূতির দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আন্‌বার জন্য মানুষকে বিশেষ-ভাবে উপদেশ কর্‌ছে। যুগপরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ করে সেই সকল মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে ঐরূপ হয়েছে তা নয়—পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐরূপ হয়েছে। আর, বিচারবিহীন সাধারণ জীব, ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ করে মর্‌ছে।

থেই হারিয়ে ফেলেছে; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে এখন উপায় কি?

স্বামিজী। পূর্ব্বের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে। আগাছা-গুলো উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জ্জনা পড়ে গেছে। সেগুলি সাফ করে ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে; তবেই তোদের ধর্ম্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য। কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে?

স্বামিজী। কেন? প্রথমত: মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন, তাঁদের লোকের কাছে Ideal (আদর্শ বা ইষ্ট) রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র, ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি? বৃন্দাবনলীলা ফীলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা; শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য। কেন, বৃন্দাবনলীলা মন্দ কি?

স্বামিজী। এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশি বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য্য

এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি-সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জান্‌বার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

শিষ্য। মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবনলীলা কি সত্য নহে?

স্বামিজী। তা কে বল্‌ছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণাও উপলব্ধি কর্‌তে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা কর্‌তে পারবে না।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহারা মধুর-সখ্যাদি ভাব অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?

স্বামিজী। আমার ত বোধ হয় তাই—বিশেষতঃ আবার যারা মধুর ভাবের সাধক বলে পরিচয় দেয়, তারা; তবে দুই একটি ঠিক ঠিক লোক থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। বাকী সব জান্‌বি—ঘোর তমোভাবাপন্ন—full of morbidity (অস্বাভাবিক মানসিক দুর্ব্বলতা-সমাচ্ছন্ন)! তাই বল্‌ছি,—দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে; শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে কর্‌তে হবে। তবে তোদের ও দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ত সকলকে লইয়া সংকীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন।

স্বামিজী। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে জীবের তুলনা হয়?

তিনি সব মতে সাধন করে দেখিয়েছেন, সকলগুলিই এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। তিনি যা করেছেন, তা কি তুই আমি কর্‌তে পার্‌ব? তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনও বুঝতে পারি নি! এজন্যই আমি তাঁর কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জান্‌তেন; তাঁর দেহটাই কেবল মানুষের মত ছিল; কিন্তু চাল চলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল!

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন কি?

স্বামিজী। তোর অবতার কথার মানেটা কি?—তা আগে বল্‌।

শিষ্য। কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের ন্যায় পুরুষ।

স্বামিজী। তুই যাদের নাম কর্‌লি, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা ত ছোট কথা—জানি। থাক্‌ এখন সে কথা, এইটুকুই এখন শুনে রাখ্‌—সময় ও সমাজ উপযোগী এক এক মহাপুরুষ আসেন—ধর্ম্ম উদ্ধার কর্‌তে; তাঁদের মহা-পুরুষ বল্‌, বা অবতার বল্‌, তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁরা সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন গঠন করবার Ideal (আদর্শ) দেখিয়ে যান্‌। যিনি যখন আসেন, তখন তাঁর ছাঁচে গড়ন চল্‌তে থাকে, মানুষ তৈরী হয়, ও সম্প্রদায় চল্‌তে থাকে। কালে ঐ সকল সম্প্রদায়

বিকৃত হলে, আবার ঐরূপ অন্য সংস্কারক আসেন; এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আস্‌ছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার ত শক্তি, বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।

স্বামিজী। তার কারণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে অত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে আমার ভয় হয়, পাছে সত্যের অপলাপ হয়; পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে না কুলোয়; বড় কর্‌তে গিয়ে, তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে, তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি!

শিষ্য। কিন্তু আজকাল অনেকে ত তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছে।

স্বামিজী। তা করুক্। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন কর্‌ছে। তোর ঐরূপ বিশ্বাস হয় ত তুইও কর্।

শিষ্য। আমি আপনাকেই সম্যক্ বুঝিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে? মনে হয়, আপনার কৃপাকণা পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্য হইব!

অদ্য এইখানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিষ্য স্বামিজীর পদধূলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

চতুর্থ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করা গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজন—কৃপাসিদ্ধ কাহাকে বলে—দেশকালনিমিত্তের অতীত রাজ্যে কে কাহাকে কৃপা করিবে।

শিষ্য। স্বামিজী, ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যাহারা গৃহস্থ তাহাদের উপায় কি? তাহাদের ত দিনরাত ঐ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়?

স্বামিজী। কামকাঞ্চনের আসক্তি না গেলে, ঈশ্বরে মন যায় না; তা গেরস্তই হোক্ আর সন্ন্যাসীই হোক্। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জান্‌বি, ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আস্‌বে না।

শিষ্য। তবে গৃহস্থদিগের উপায়?

স্বামিজী। উপায় হচ্ছে, ছোট খাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া, আর বড় বড় গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না—"যদি ব্রহ্মা

স্বয়ং বদেৎ”—(বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা বলিলেও হইবে না।)

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিষয় ত্যাগ হয়?

স্বামিজী। তা কি কখন হয়?—তবে সন্ন্যাসীরা কামকাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা কর্‌ছে, আর গেরস্তরা নোঙ্গর ফেলে নৌকায় দাঁড় টান্‌ছে—এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখন মেটে কি রে? “ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে”—দিন দিন বাড়্‌তেই থাকে।

শিষ্য। কেন? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হইলে শেষে ত বিতৃষ্ণা আসিতে পারে?

স্বামিজী। দূর ছোঁড়া, তা কজনের আস্‌তে দেখেছিস্‌? ক্রমাগত বিষয় ভোগ করতে থাক্‌লে, মনে সেই সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়—দাগ পড়ে যায়—মন বিষয়ের রঙে রোঙে যায়। ত্যাগ—ত্যাগ—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। কেন মহাশয়, ঋষিবাক্য ত আছে—“গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্‌”—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদি ভোগ হইতে বিরত রাখাকেই তপস্যা বলে; বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দূর হইলে, গৃহই তপোবনে পরিণত হয়।

স্বামিজী। গৃহে থেকে যারা কামকাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে পারে, তারা ধন্য; কিন্তু তা কয় জনের হয়?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আপনি ত ইতিপূর্ব্বেই বলিলেন যে, সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন-ত্যাগ হয় নাই?

স্বামিজী। তা বলেছি; কিন্তু একথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের পথে চলেছে, তারা কামকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের কামকাঞ্চনাসক্তিটাকে এখনও বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আত্মোন্নতির চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই এখনও আসে নাই।

শিষ্য। কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও ত অনেকে ঐ আসক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে?

স্বামিজী। যারা কর্‌ছে তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হবে; তাদেরও কামকাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু কি জানিস্—'যাচ্ছি যাব' 'হচ্ছে হবে' যারা এইরূপে চলেছে, তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দূরে। "এখনি ভগবান লাভ কর্‌ব, এই জন্মেই কর্‌ব"—এই হচ্ছে বীরের কথা। ঐরূপ লোকে এখনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হয়; শাস্ত্র তাদের সম্বন্ধেই বলছেন—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—যখনি বৈরাগ্য আস্‌বে, তখনি সংসার ত্যাগ কর্‌বে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঠাকুর ত বলিতেন, ঈশ্বরের কৃপা হইলে, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি এই সকল আসক্তি এক দণ্ডে কাটাইয়া দেন।

স্বামিজী। হাঁ, তাঁর কৃপা হলে হয় বটে, কিন্তু তাঁর কৃপা পেতে হলে আগে শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই; তবেই তাঁর কৃপা হয়।

শিষ্য। কিন্তু কায়মনোবাক্যে সংযম করিতে পারিলে, কৃপার আর দরকার কি? তাহা হইলে ত আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম।

স্বামিজী। তুই প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছিস্ দেখে, তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle (উদ্যম বা পুরুষকার) না করে বসে থাক্, দেখ্‌বি কখনও কৃপা হবে না।

শিষ্য। ভাল হইব, ইহা বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু কি দুর্লক্ষ্য সূত্রে যে মন নীচগামী হয়, তাহা বলিতে পারি না; সকলেরই কি মনে ইচ্ছা হয় না যে, আমি সৎ হইব —ভাল হইব—ঈশ্বর লাভ করিব?

স্বামিজী। যাদের ভেতর ওরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাদেরই ভেতরে জান্‌বি Struggle (ঐরূপ হইবার চেষ্টা) এসেছে, এবং ঐ চেষ্টা করতে করতেই ঈশ্বরের দয়া হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতারে ত ইহাও দেখা যায়, যাহাদের আমরা ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, তাহারাও সাধন ভজন না করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অনায়াসে ঈশ্বর লাভে সক্ষম হইয়াছিল—ইহার অর্থ কি?

স্বামিজী। জান্‌বি, তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল; ভোগ করতে করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের

হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে, তাদের দেহ ছুটে যেত তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুনের ভেতর দিয়ে ঐ সকল লোক ধর্ম্মপথে উঠেছিল।

শিষ্য। তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেও ত তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল?

স্বামিজী। হাঁ, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়ীতে ঢোকা ভাল নয় কি? —এবং ঐ পথেও ত "কি করে মনের এ অশান্তি দূর করি" এইরূপ একটা বিষয় হাঁক্‌পাকানি ও চেষ্টা আছে?

শিষ্য। তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, যাহারা ইন্দ্রিয়াদি দমন ও কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে উদ্যত, তাহারা পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; এবং যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দূর করিয়া অন্তে পরম পদ দেন।

স্বামিজী। হাঁ, তবে ঐরূপ লোক বিরল; সিদ্ধ হবার পর লোকে উহাদিগকেই কৃপাসিদ্ধ বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। তাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একদিন আমায় বলিয়াছিলেন যে, "কৃপা পক্ষে কোন নিয়ম নাই। যদি থাকে, তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা।"

স্বামিজী। তা নয় রে তা নয়; ঘোষজা যেখানকার কথা বলেছে, সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশকাল নিমিত্তের অতীত স্থানের কথা; সেখানে Law of Causation (কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ) নেই, কাজেই সেখানে কে কারে কৃপা করবে?—সেখানে সেব্য সেবক, ধ্যাতা ধ্যেয়, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হয়ে যায়—সব সমরস।

শিষ্য। আজ তবে আসি। আপনার কথা শুনিয়া আজ বেদ-বেদান্তের সার বুঝা হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র করা হইতেছিল।

স্বামিজীর পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইল।

পঞ্চম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

খাদ্যাখাদ্যের বিচার কি ভাবে করিতে হইবে—আমিষাহার কাহার করা কর্ত্তব্য—ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কি ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন।

শিষ্য। স্বামিজী, খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্ম্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি ?

স্বামিজী। অল্প বিস্তর আছে বই কি।

শিষ্য। মাছ মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্যক কি ?

স্বামিজী। খুব খাবি বাবা ! তাতে যা পাপ হবে, তা আমার। *

---

* স্বামিজীর ঐরূপ উত্তরে কেহ না ভাবিয়া বসেন—তিনি মাংসাহার বিষয়ের অধিকারী বিচার করিতেন না। তাঁহার যোগবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে তিনি আহার সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দুষ্পাচ্য বলিয়া যাহা অজীর্ণাদি রোগের উৎপত্তি করে অথবা উহা না করিলেও শরীরের উষ্ণতা অযথা বৃদ্ধি করিয়া যাহা ইন্দ্রিয় ও মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহাদের মাংসাহারে প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদিগকে স্বামিজী পূর্ব্বোক্ত দুই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহা ভোজন করিতে উপদেশ দিতেন। নতুবা আমিষাহার একেবারে বর্জ্জন করিতে বলিতেন। অথবা, আমিষাহার করিব কি না—এ প্রশ্নের সমাধান তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক পবিত্রাদি লক্ষ্য করিয়া আপনিই করিয়া লইতে বলিতেন।

তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া—বুকে সাহস ও উদ্যম-শূন্যতা—পেটটি বড়—হাত পায়ে বল নেই—ভীরু ও কাপুরুষ !

শিষ্য। মাছ মাংস খাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্মে অহিংসাকে 'পরমো ধর্ম্মঃ' বলিয়াছে কেন ?

স্বামিজী। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম মরে যাবার সময় হিন্দুধর্ম্ম উহার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভিতর ঢুকিয়ে আপনার করে নিয়েছিল। ঐ ধর্ম্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে বিখ্যাত। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না করে বলপূর্ব্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত ইতর সাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে, বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে—আর, টাকার জন্য ভায়ের সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছে!—এমন "বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ" এ জীবনে অনেক দেখেছি। অন্যপক্ষে দেখ্—বৈদিক ও মনূক্ত ধর্ম্মে মৎস্য মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারি-বিশেষে

ভারতের ইতর সাধারণ গৃহস্থের সম্বন্ধে কিন্তু স্বামিজী আমিষাহারের পক্ষপাতী লেন। তিনি বলিতেন, বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য আমিষাশী জাতিদিগের ইত তাহাদিগের জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে, এজন্য ংসাহার তাহাদের পক্ষে এখন একান্ত প্রয়োজনীয়।

হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসাধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থ আছে। শ্রুতি বলেছেন—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব-ভূতানি, মনুও বলেছেন—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।

শিষ্য। এখন কিন্তু দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্ম্মের দিকে একা ঝোঁক হইলেই লোকে আগে মাছ মাংস ছাড়িয়া দেয় অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপের অপেক্ষাও যেন মাছ মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ!—এ ভাবটা কোথা হইতে আসিল?

স্বামিজী। কোথেকে এলো, তা জেনে তোর দরকার কি? তবে ঐ মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করেছে, তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? দেখ্‌না—তোদের পূর্ব্ববঙ্গের লোক খুব মাছ মাংস খায়, কচ্ছপ খায়, তাই তারা পশ্চিমবাঙ্গলার লোকের চেয়ে সুস্থ-শরীর। তোদের পূর্ব্ববাঙ্গলার বড় মানুষেরাও এখন রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে শেখেনি। তাই আমাদের দেশের লোকগুলোর মত অম্বলের ব্যারামে ভোগে না। শুনেছি, পূর্ব্ববাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে লোকে অম্বলের ব্যারাম কাকে বলে, তা বুঝ্‌তেই পারে না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। আমাদের দেশে অম্বলের ব্যারাম বলিয়া কোন ব্যারাম নাই। এদেশে আসিয়া ঐ ব্যারামের নাম শুনিয়াছি। দেশে আমরা দুবেলাই মাছ ভাত খাইয়া থাকি।

স্বামিজী। তা খুব খাবি। ঘাস পাতা খেয়ে যত পেটরোগা

বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও সব সত্ত্বগুণের চিহ্ন নয়। মহা তমোগুণের ছায়া—মৃত্যুর ছায়া। সত্ত্বগুণের চিহ্ন হচ্ছে—মুখে উজ্জ্বলতা—হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ —Tremendous activity—আর, তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য—জড়তা—মোহ—নিদ্রা এই সব!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাছ মাংসে ত রজোগুণ বাড়ায়।

স্বামিজী। আমি ত তাই চাই। এখন রজোগুণেরই ত দরকার। দেশের যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্—তাদের ভিতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে ত ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা—দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? এখন দেশের লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুল্‌তে হবে, জাগাতে হবে—কার্য্যতৎপর কর্‌তে হবে। নতুবা ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে—গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যাবে। তাই বল্‌ছিলুম, মাছ মাংস খুব খাবি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনে যখন সত্ত্বগুণের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি হয়, তখন মৎস্য মাংসে স্পৃহা থাকে কি?

স্বামিজী। না, তা থাকে না। সত্ত্বগুণের যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ প্রকাশের এই সব লক্ষণ জান্‌বি, পরের জন্য সর্ব্বস্ব পণ—কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি—নিরভিমানিত্ব—অহংবুদ্ধি-শূন্যত্ব। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal

৩

foodএর (আমিষাহারের) ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখবি—মনে ঐ সব গুণের স্ফূর্তি নেই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে—সেখানে জানবি, হয় ভণ্ডামি, না হয় লোকদেখান ধর্ম্ম। তোর যখন ঠিক্ ঠিক্ সত্বগুণের অবস্থা হবে তখন আমিষাহার ছেড়ে দিস।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ত আছে "আহারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ"—শুদ্ধ বস্তু আহার করিলে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। অতএব সত্বগুণী হইবার জন্য রজঃ ও তমোগুণোদ্দীপক পদার্থ সকলের ভোজন পূর্ব্বেই ত্যাগ করা কি এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে ?

স্বামিজী। ঐ শ্রুতির অর্থ কর্‌তে গিয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—"আহার" অর্থে "ইন্দ্রিয়-বিষয়"; আর, শ্রীরামানুজ স্বামী "আহার" অর্থে খাদ্য ধরেছেন। আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। কেবল দিনরাত খাদ্যাখাদ্যের বাদ্‌বিচার করে জীবনটা কাটাতে হবে—না, ইন্দ্রিয়সংযম করতে হবে ? ইন্দ্রিয়-সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধর্‌তে হবে; আর ঐ ইন্দ্রিয় সংযমের জন্যই ভাল মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্প বিস্তর বিচার কর্‌তে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়। (১ম) জাতিদুষ্ট —যেমন পেঁয়াজ, রশুন ইত্যাদি। (২য়) নিমিত্তদুষ্ট—যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশ গণ্ডা মাছি মরে পড়ে রয়েছে—রাস্তার ধুলোই কত উড়ে পড়্‌ছে,

ইত্যাদি। (৩য়) আশ্রয়দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট হয়েছে কি না, তা সকল সময়েই খুব নজর রাখ্‌তে হয়। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটি—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝ্‌তেই পারে না,—নিয়েই দেশে যত লাঠালাঠি চল্‌ছে—'ছুঁয়োনা' 'ছুঁয়োনা' করে ছুঁৎমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই—গলায় একগাছা সুতো থাকলেই হল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নেই। খাদ্যের আশ্রয়দোষ ধর্‌তে পারা একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে তিনি কোন কোন লোকের ছোঁয়া খেতে পারেন নি। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জান্‌তে পেরেছি—বাস্তবিকই সে সকল লোকের ভিতর কোন না কোন বিশেষ দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম্ম এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ীর মধ্যে! অপর জাতির ছোঁয়া ভাতটা না খেলেই যেন ভগবান্ লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের মহান্ সত্য সকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই মারামারি চল্‌ছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চান, সকলের স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য?

স্বামিজী। তা কেন বল্‌বো? আমার কথা হচ্ছে, তুই বামুন,

অপর জাতের অন্ন নাই খেলি; কিন্তু তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবিনি? তোরা রাঢ়ীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামুনের অন্ন খেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেন্দ্র বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠী তেলিঙ্গী ও কনোজী বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? কল্‌কাতায় জাতবিচারটা আরও কিছু মজার; দেখা যায়, অনেক বামুন কায়েতই হোটেলে ভাত মারছেন; তাঁরাই আবার মুখ পুঁছে এসে সমাজের নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই অন্যের জন্য জাতবিচার ও অন্নবিচারের আইন করছেন! বলি, ঐ সব কপটীদের আইনমত কি সমাজকে চল্‌তে হবে? ওদের কথা ফেলে দিয়ে সনাতন ঋষিদের শাসন চালাতে হবে—তবেই দেশের কল্যাণ।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, কলিকাতায় অধুনাতন সমাজে ঋষি-শাসন চলিতেছে না?

স্বামিজী। *শুধু কল্‌কাতায় কেন?—আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষিশাসনের ঠিক্ ঠিক্ প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার, আর স্ত্রী-*আচার—এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে। শাস্ত্র ফাস্ত্র কি কেউ পড়ে—না, পড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?

শিষ্য। তবে মহাশয়, এখন আমাদের কি করিতে হইবে?

স্বামিজী। ঋষিগণের মত চালাতে হবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি

ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত কর্‌তে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে দিতে হবে। এই দেখ্‌না, ভারতের কোথাও আর চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার্‌ জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ কর্‌তে হবে। সব বামুন এক করে একটি ব্রাহ্মণ জাত গড়্‌তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত্‌ করে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আন্‌তে হবে। নতুবা শুধু 'তোমায় ছোঁবনা' বল্লেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখন নয়।

ষষ্ঠ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

ভারতের দুর্দ্দশার কারণ—উহা দূরীকরণের উপায়—বৈদিক ছাঁচে দেশটাকে পুনরায় গড়িয়া তোলা এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ন্যায় মানুষ তৈয়ার করা।

শিষ্য। স্বামিজী, বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দ্দশা হইয়াছে কেন ?

স্বামিজী। তোরাই সে জন্য দায়ী।

শিষ্য। বলেন কি ?—কেমন করিয়া ?

স্বামিজী। বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না করে করে তোরা এখন জগতে ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস্!

শিষ্য। কবে আবার আমরা উহাদের ঘৃণা করিলাম ?

স্বামিজী। কেন ? ভট্‌চাযের দল তোরাই ত, বেদবেদান্তাদি যত সারবান্ শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণেতর জাত্‌দের কখন পড়্‌তে দিস্‌নি—তাদের ছুঁস্‌নি—তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেখেছিস্—স্বার্থপরতা থেকে তোরাই ত চিরকাল ঐরূপ করে আসছিস্। ব্রাহ্মণেরাই ত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে করে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ বলে বলে তাদের

মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্য সত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বস্‌তে সর্ব্বক্ষণ বলিস্ "তুই নীচ," "তুই নীচ," তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে যে "আমি সত্য সত্যই নীচ।" ইংরাজীতে একে বলে Hypnotise (হিপ্‌নোটাইজ্) করা। ব্রাহ্মণেতর জাতগুলির একটু একটু করে চমক্ ভাঙ্গছে। ব্রাহ্মণদের তন্ত্রে মন্ত্রে তাদের আস্থা কমে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে পদ্মার পাড় ধসে যাবার মত ব্রাহ্মণদের সব তুক্ তাক্ এখন ভেঙ্গে পড়্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ত ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

স্বামিজী। পড়্‌বে না ? ব্রাহ্মণরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার অত্যাচার আরম্ভ করেছিল ; স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য কত কি অদ্ভুত অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল, তার ফলও তাই হাতেহাতে পাচ্ছে।

শিষ্য। কি ফল পাইতেছে মহাশয় ?

স্বামিজী। ফলটা কি, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না ? তোরা যে ভারতের অপর সাধারণ জাতগুলিকে ঘেন্না করেছিলি, তার জন্যই এখন তোদের হাজার বৎসরের দাসত্ব কর্‌তে হচ্ছে,—তাই তোরা এখন বিদেশীর ঘৃণাস্থল ও স্বদেশ-বাসিগণের উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিস্ !

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, এখনও ত ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণের মতেই চলিতেছে; গর্ভাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপই লোকে—ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিতেছেন—সেইরূপই করিতেছে। তবে আপনি ঐরূপ বলিতেছেন কেন?

স্বামিজী। কোথায় চল্ছে? শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চল্ছে? আমি ত ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্ব্বত্রই শ্রুতি-স্মৃতি-বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার, এই এখন সর্ব্বত্র স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! কে কার কথা শুনছে? টাকা দিতে পারলেই ভট্চাযের দল যা তা বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন! কয়জন ভট্চায বৈদিক কল্প, গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্র পড়্ছেন? তারপর দেখ্, বাঙ্গালায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখ্বি মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ্, মনুস্মৃতির শাসন চলেছে! তোরা ভাবিস্—সর্ব্বত্র বুঝি একমত চলেছে! সেজন্যই আমি চাই—বেদের প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়ে বেদের চর্চ্চা করাতে ও সর্ব্বত্র বেদের শাসন চালাতে।

শিষ্য। মহাশয়, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর?

স্বামিজী। বেদের সকল প্রাচীন নিয়মগুলিই চল্বে না বটে, কিন্তু সময়োপযোগী বাদ-সাদ্ দিয়ে, নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করে নূতন ছাঁচে গড়ে, সমাজকে দিলে, চল্বে না কেন?

শিষ্য। মহাশয়, আমার ধারণা ছিল, অন্ততঃ মনুর শাসনটা ভারতে সকলেই এখনও মানে।

[স্ব]ামিজী। কোথায় মান্‌ছে? তোদের নিজেদের দেশেই দেখ্‌না তন্ত্রের বামাচার তোদের হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যা মৃত বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালাবশিষ্ট—তাতেও ঘোর বামাচার ঢুকেছে। ঐ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা খর্ব্ব কর্‌তে হবে।

[শি]ষ্য। মহাশয়, এ পঙ্কোদ্ধার এখন সম্ভব কি?

[স্ব]ামিজী। তুই কি বল্‌ছিস্, ভীরু, কাপুরুষ। অসম্ভব বলে বলে তোরা দেশটা মজালি। মানুষের চেষ্টায় কি না হয়?

[শি]ষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ দেশে পুনরায় না জন্মালে উহা সম্ভবপর মনে হয় না।

[স্ব]ামিজী। আরে, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার জন্যই ত তাঁরা মনু; যাজ্ঞবল্ক্য হয়ে ছিলেন, না, আর কিছু? চেষ্টা কর্‌লে আমরাই যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের চেয়ে ঢের বড় হতে পারি, আমাদের মতই বা তখন চলবে না কেন?

[শি]ষ্য। মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে আপনিই ত বলিলেন, প্রাচীন আচারাদি দেশে চালাইতে হইবে। তবে মন্বাদিকে আমাদেরই মত একজন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

[স্ব]ামিজী। কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি? তুই আমার কথাই বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না। আমি কেবল বলেছি যে প্রাচীন বৈদিকাচারগুলি, সমাজ ও সময়োপযোগী করে নূতন ছাঁচে গড়ে নূতন ভাবে দেশে চালাতে হবে। নয় কি?

[শি]ষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

[স্ব]ামিজী। তবে ও কি বল্‌ছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিস্,

আমার আশা ভরসা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক্ ঠিক্ বুঝে সেই ভাবে কাজে লেগে যা।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা লইবে কেন?

স্বামিজী। তুই যদি ঠিক্ ঠিক্ বুঝাতে পারিস্ ও যা বল্‌বি তা হাতেনাতে করে দেখাতে পারিস্ ত অবশ্য নেবে। আর তোতাপাখীর মতন যদি কেবল শ্লোকই আওড়াস্, বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মত কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হলে তোর কথা কে শুন্‌বে বল্?

শিষ্য। মহাশয়, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই একটি উপদেশ দিন।

স্বামিজী। উপদেশ ত তোকে ঢের দিলুম; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে পরিণত কর্। জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র পড়া ও আমার কথা শোনা সার্থক হয়েছে। এই যে মন্বাদি শাস্ত্র পড়্‌লি, আরও কত কি পড়্‌লি, বেশ করে ভেবে দেখ্ এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি? সেই ভিত্তিটা বজায় রেখে সার সার তত্ত্বগুলি প্রাচীন ঋষিদের মত সংগ্রহ কর্ ও সময়োপযোগী মত সকল তাতে নিবদ্ধ কর; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস্, যেন সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের, সকল সম্প্রদায়েরই ঐ সকল নিয়ম পালনে যথার্থ কল্যাণ হয়। লেখ্ দেখি, ঐরূপ একখানা স্মৃতি; আমি দেখে সংশোধন করে দেব এখন।

শিষ্য। মহাশয়, ব্যাপারটি সহজসাধ্য নহে; কিন্তু ঐরূপে স্মৃতি লিখিলেও উহা চলিবে কি?

স্বামিজী। কেন চল্‌বে না? তুই লেখ্ না। "কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"—যদি ঠিক্ ঠিক্ লিখিস্ ত একদিন না একদিন চল্‌বেই। আপনাতে বিশ্বাস রাখ্। তোরাই ত পূর্ব্বে বৈদিক ঋষি ছিলি। শুধু শরীর বদ্‌লিয়ে এসেছিস্ বইত নয়?—আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, তোদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ্, ওঠ্ লেগে পড়, কোমর বাঁধ।—কি হবে দুদিনের ধন মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস্—আমি মুক্তি ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া; একটা মানুষ তৈরী কর্‌তে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐরূপে কার্য্যে লাগিয়াই বা কি হইবে? মৃত্যু ত পশ্চাতে!

স্বামিজী। দূর ছোঁড়া, মর্‌তে হয়, একবারই মরবি। কাপুরুষের মত অহরহঃ মৃত্যু-চিন্তা করে বার বার মর্‌বি কেন?

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, মৃত্যু-চিন্তা না হয় নাই করিলাম কিন্তু এই অনিত্য সংসারে কর্ম্ম করিয়াই বা ফল কি?

স্বামিজী। ওরে মৃত্যু যখন অনিবার্য্য, তখন ইট পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের ন্যায় মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দুদিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? It is better to wear out than to rust out—জরাজীর্ণ হয়ে একটু

একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের ন্যায় অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে ফস্ করে মরাটা ভাল নয় কি ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম।

স্বামিজী। ঠিক্ ঠিক্ জিজ্ঞাসুর কাছে দুরাত্রি বক্‌লেও আমার শ্রান্তি বোধ হয় না, আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অনবরত বক্‌তে পারি। ইচ্ছা কর্‌লে ত আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাক্‌তে পারি। আর, আজকাল দেখ্‌ছিস্ ত মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার ভাবনা নেই, কোন না কোন রকম জোটেই জোটে; তবে কেন ঐরূপ করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাক্‌তে পারিনে!—সমাধি ফমাদি তুচ্ছ বোধ হয়—"তুচ্ছং ব্রহ্মপদং" হয়ে যায়!—তোদের মঙ্গল-কামনা হচ্ছে আমার জীবন-ব্রত। যে দিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মার্‌ব!

শিষ্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামিজীর ঐ সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল! পরে বিদায় গ্রহণের আশায় তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহাশয়, আজ তবে আসি।"

স্বামিজী। আস্‌বি কেন রে? মঠে থেকেই যা না। সংসারীদের ভেতর গেলে মন আবার মলিন হয়ে যাবে। এখানে দেখ্, কেমন হাওয়া, গঙ্গার তীর, সাধুরা সাধন ভজন

কর্‌ছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর কল্‌কাতায় গিয়েই ছাই ভস্ম ভাব্‌বি।

শিষ্য সহর্ষে বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এখানেই থাকিব।"

স্বামিজী। 'আজ' কেন রে?—একেবারে থেকে যেতে পারিস না? কি হবে ফের সংসারে গিয়ে?

শিষ্য স্বামিজীর ঐ কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল; মনে নানা চিন্তার যুগপৎ উদয় হওয়ায় কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

সপ্তম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

স্থানকালাদির শুদ্ধতাবিচার কতক্ষণ—আত্মার প্রকাশের অন্তরায় যাহা নাশ করে তাহাই সাধনা—'ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের লেশমাত্র নাই', শাস্ত্রবাক্যের অর্থ—নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে—কর্ম্মের দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তথাপি স্বামিজী দেশের লোককে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন কেন? ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সুনিশ্চিত।

স্বামিজীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ; মঠের নূতন জমিতে যে প্রাচীন বাড়ী ছিল, তাহার ঘরগুলি মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতিপূর্ব্বেই সমতল করা হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী আজ অপরাহ্নে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামিজীর হস্তে একটি দীর্ঘ যষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙের ফ্লানেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিষ্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইয়া ফটক পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় উত্তরাস্যে ফিরিতেছেন—এইরূপে বাড়ী হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত বারম্বার পদচারণা করিতেছেন! দক্ষিণ পার্শ্বে বিল্বতরুমূল বাঁধান হইয়াছে; ঐ বেলগাছের অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামিজী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেন—

"গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আন্‌ব চণ্ডী, শুন্‌ব কত চণ্ডী,
আস্‌বে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥"

(ইত্যাদি)

গান গাহিতে গাহিতে শিষ্যকে বলিলেন,—"হেথা আস্‌বে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী—বুঝ্‌লি? কালে এখানে কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হবে"—বলিতে বলিতে বিল্বতরুমূলে উপবেশন করিলেন ও বলিলেন, "বিল্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে বসে ধ্যান ধারণা কর্‌লে শীঘ্র উদ্দীপনা হয়। ঠাকুর একথা বল্‌তেন।"

শিষ্য। মহাশয়, যাহারা আত্মানাত্মবিচারে রত, তাহাদের স্থানাস্থান, কালাকাল, শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারের আবশ্যকতা আছে কি?

স্বামিজী। যাঁদের আত্মজ্ঞানে "নিষ্ঠা" হয়েছে, তাঁদের ঐ সকল বিচার কর্‌বার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু ঐ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই হল? কত সাধ্য সাধনা কর্‌তে হয়, তবে হয়! তাই প্রথম প্রথম এক আধটা বাহ্য অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। পরে যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন কোন অবলম্বনের আর দরকার থাকে না।

শাস্ত্রে নানা প্রকার সাধনমার্গ যে সব নির্দ্দিষ্ট হয়েছে,

সে কেবল ঐ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য। তবে অধিকারী ভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ঐ সকল সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম্ম, এবং যতক্ষণ কর্ম্ম, ততক্ষণ আত্মার দেখা নাই। আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্রোক্ত সাধনরূপ কর্ম্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্ম্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্ম-প্রকাশের শক্তি নেই; কতকগুলি আবরণকে দূর করে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভায় আপনি উদ্ভিন্ন হয়। বুঝ্‌লি? এইজন্য তোর ভাষ্যকার বল্‌ছেন —"ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।"

শিষ্য। কিন্তু মহাশয় কোন না কোনরূপ কর্ম্ম না করিলে যখন আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাশ হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্ম্মই ত জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্বামিজী। কার্য্যকারণ পরম্পরা-দৃষ্টিতে আপাততঃ ঐরূপ প্রতীয়মান হয় বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রে ঐরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করেই, কাম্য কর্ম্ম নিশ্চিত ফল প্রসব করে একথা বলা হয়েছে। নির্ব্বিশেষ আত্মার দর্শন কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা হবার নয়। কারণ, আত্মজ্ঞানপিপাসুর পক্ষে বিধান এই যে, সাধনাদি কর্ম্ম কর্‌বে, অথচ তার ফলাফলে উদাসীন থাক্‌বে। তবেই হল, ঐ সকল সাধনাদি কর্ম্ম সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কারণ ঐ সাধনাদির ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে আর শাস্ত্রে সাধককে ঐ সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর্‌তে বল্‌ত না। অতএব মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত

ফলপ্রসূ কর্ম্মবাদের নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে। বুঝ্লি ?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কর্ম্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে কষ্টকর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ?

স্বামিজী। শরীর ধারণ করে সর্ব্বক্ষণ একটা কিছু না করে থাক্‌তে পারা যায় না। জীবকে যখন কর্ম্ম কর্‌তেই হচ্ছে, তখন যেরূপে কর্ম্ম কর্‌লে আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপে কর্ম্ম কর্‌তেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে বলা হয়েছে। আর তুই যে বল্লি—'প্রবৃত্তি হবে কেন?'—তার উত্তর হচ্ছে এই যে যত কিছু কর্ম্ম করা যায়, তা সবই প্রবৃত্তি-মূলক ; কিন্তু কর্ম্ম করে করে যখন কর্ম্ম হতে কর্ম্মান্তরে, জন্ম হতে জন্মান্তরেই কেবল গতি হতে থাকে, তখন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনা আপনি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে, এই কর্ম্মের অন্ত কোথায় ? তখনি সে—গীতামুখে ভগবান্ যা বল্‌ছেন—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"—তার মর্ম্ম বুঝতে পারে। অতএব যখন কর্ম্ম করে করে আর শান্তিলাভ হয় না, তখনই সা[illegible] কর্ম্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহ ধারণ করে কিছু এ[illegible] নিয়ে ত থাকতে হবে—কি নিয়ে থাক্‌বে বল্‌[illegible] দু চার্‌টে সৎকর্ম্ম করে যায়, কিন্তু ঐ কর্ম্মের [illegible]র প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, তখন তারা জেনেছে যে[illegible] কর্ম্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অঙ্কুর নিহিত আছে। সে[illegible] জন্যই ব্রহ্মজ্ঞেরা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী—লোক-দেখানো দু চারটে

কর্ম্ম করলেও তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আঁট নেই। এরাই শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী বলে কথিত হয়েছে।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞের উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির ন্যায়?

স্বামিজী। তা কেন? নিজের জন্য, আপন শরীর মনের সুখের জন্য কর্ম্ম না করাই হচ্ছে কর্ম্মফল ত্যাগ করা। ব্রহ্মজ্ঞ নিজ সুখান্বেষণই করেন না; কিন্তু অপরের কল্যাণ বা যথার্থ সুখ লাভের জন্য কেন কর্ম্ম কর্‌বেন না? তাঁরা ফলাসঙ্গরহিত হয়ে যা কিছু কর্ম্ম করে যান্, তাতে জগতের হিত হয়—সে সব কর্ম্ম "বহুজনহিতায়," "বহুজনসুখায়" হয়। ঠাকুর বলতেন, "তাদের পা কখনও বেতালে পড়ে না।" তাঁরা যা যা করেন, তাই অর্থবন্ত হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িস্ নি—

"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।"

অর্থাৎ ঋষিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কথনও নিরর্থক বা মিথ্যা হয় না। মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃত্তিহীন-প্রায় হয়, তখন 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার সুখভোগ কর্‌বার বাসনা থাকে না—মনে আর সংকল্প-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ সমাধি বা ঐ বৃত্তিহীনাবস্থা থেকে নেমে মন যখন আবার 'আমি আমার' রাজ্যে আসে, তখন পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বা অভ্যাস বা প্রারব্ধজনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম্ম

চল্‌তে থাকে। মন তখন প্রায়ই Superconscious (জ্ঞানাতীত) অবস্থায় থাকে; না খেলে নয়—তাই খাওয়া দাওয়া থাকে—দেহাদি বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে পৌঁছে যা যা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক কর্‌তে পারা যায়; সেই সকল কার্য্যে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়; কারণ, তখন কর্ত্তার মন আর স্বার্থপরতায় বা নিজের লাভ লোকসান খতিয়ে দূষিত হয় না। ঈশ্বর Superconscious stateএ (জ্ঞানাতীত ভূমিতে) সর্ব্বদা অবস্থান করেই এই জগদ্রূপ বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন;—এ সৃষ্টিতে সেইজন্য কোন কিছু Imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজন্যই বল্‌ছিলুম—আত্মজ্ঞ জীবের ফলাসঙ্গরহিত কর্ম্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না—তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

শিষ্য। আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিলেন, জ্ঞান এবং কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা দর্শন হয় না, তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ মধ্যে মধ্যে দেন কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন—"কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

স্বামিজী। আমি দুনিয়া ঘুরে দেখ্‌লুম—এ দেশের মত এত অধিক তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে

ইট্-পাট্কেলের মত জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্ম্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাক্‌তে পার্‌বে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিস্। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্ম্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ। তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুট্‌তে পার্‌ছে না—সর্ব্বাঙ্গে Paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ কর্‌তে চাই। শরীরে বল নেই—হৃদয়ে উৎসাহ নেই—মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই!—কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভিতর সাড়্ আন্‌তে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এই অভয়বাণী শুনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কার্য্যে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডালব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে বল্‌গে যা, তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর্—জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের

কথা তাদের বল। আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন—উত্তম ভোগ আগে কর্‌তে শিখুক, তার পর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পার্‌বে, তা বলে দে। আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে—বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? কান্না পায় না? মাদ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, বাঙ্গালা—যে দিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস্—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস্? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভিতরে পুরে, পাশ করে ভাবছিস্—আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরানীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাক্‌রী—এই ত?—এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ্ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি—কখনও নয়। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে মাটি খুঁড়্‌তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকুরী গুখুরী করে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্নবস্ত্রের

সংস্থান কর্‌বার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে, চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি কচ্ছিস্? ফেলে দে তোর শাস্ত্র ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোক-গুলোকে আগে অন্নসংস্থান কর্‌বার উপায় শিখিয়ে দে, তার পর ভাগবত পড়ে শুনাস্। (কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে, ধর্ম্ম-কথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি, আগে আপনার ভিতর অন্তর্নিহিত আত্ম-শক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর দেশের ইতর সাধারণ সকলের ভিতর যতটা পারিস্ ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে, প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্ম্মলাভ কর্‌তে তাদের শেখা।) আর বসে থাক্‌বার সময় নেই—কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বল্‌তে পারে?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ, দুঃখ ও করুণার সহিত অপূর্ব্ব এক তেজের মিলনে স্বামিজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার তখনকার সেই দিব্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে শিষ্যের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে স্বামিজী পুনরায় বলিলেন, "ঐরূপ কর্ম্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আস্‌বেই আস্‌বে—বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি; There is no escape (গত্যন্তর নাই); যারা বুদ্ধিমান্, তারা ভাবী তিন যুগের ছবি সাম্‌নে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পায়।

"ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে—কালে তার উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-করে আলোকিত হবে।"

অষ্টম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার কঠোর নিয়ম—সাত্ত্বিক-প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকেই ঠাকুরের ভাব লইতে পারিবে—শুধু ধ্যানাদিতে নিযুক্ত থাকাই এ যুগের ধর্ম্ম নহে—এখন চাই উহার সহিত গীতোক্ত কর্ম্মযোগ।

বর্ত্তমান মঠ-বাটী নির্ম্মাণ হইয়াছে, সামান্য একটু আধটু যাহা বাকী আছে, তাহা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামিজীর অভিমতে শেষ করিতেছেন। স্বামিজীর শরীর তত ভাল নয়, তাই ডাক্তারগণ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাবুদের বজ্‌রাখানি কিছুদিনের জন্য স্বামী নিত্যানন্দ চাহিয়া আনিয়াছেন। মঠের সাম্‌নে সেখানা বাঁধা রহিয়াছে। স্বামিজী ইচ্ছামত কখনও কখনও ঐ বজ্‌রায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আজ রবিবার। শিষ্য মঠে আসিয়াছে এবং আহারান্তে স্বামিজীর ঘরে বসিয়া স্বামিজীর সহিত কথোপকথন করিতেছে। মঠে স্বামিজী এই সময় সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন; গৃহস্থদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকাই ঐগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যথা,—পৃথক্ আহারের স্থান, পৃথক্ বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি। ঐ বিষয় লইয়াই এখন কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

স্বামিজী। গেরস্তদের গায়ে কাপড়ে আজকাল কেমন একটা সংযমহীনতার গন্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরস্তরা সাধুদের বিছানায় না বসে, শোয়। আগে শাস্ত্রে পড়্‌তুম যে, ঐরূপ পাওয়া যায় এবং সেজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের গন্ধ সহিতে পারে না; এখন দেখ্‌ছি ঠিক কথা। নিয়মগুলি প্রতিপালন করে চল্‌লে, বাল-ব্রহ্মচারিদের কালে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হবে। সন্ন্যাস-নিষ্ঠা দৃঢ় হলে পর, গৃহস্থদের সহিত সমভাবে মিলে মিশে থাক্‌লেও আর ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন নিয়মের গণ্ডির ভিতর না রাখ্‌লে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা সব বিগড়ে যাবে। যথার্থ ব্রহ্মচারী হতে হলে প্রথম প্রথম সংযম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করে চল্‌তে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ থেকে ত দূরে থাক্‌তেই হয়, তা ছাড়া, স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গও ত্যাগ কর্‌তেই হয়।

গৃহস্থাশ্রমী শিষ্য স্বামিজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদিগের সহিত পূর্ব্বের মত সমভাবে মিশিতে পারিবে না ভাবিয়া বিমর্ষ হইয়া কহিল, "কিন্তু মহাশয়, এই মঠ ও মঠস্থ যাবতীয় লোককে আমার বাড়ী ঘর স্ত্রী-পুত্রের অপেক্ষা অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। ইহারা সকলে যেন কতকালের চেনা! মঠে আমি যেমন সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করি জগতের কোথাও আর তেমন করি না!"

স্বামিজী। যত শুদ্ধসত্ত্ব লোক আছে, সবারই এখানে ঐরূপ অনুভূতি হবে। যার হয় না, সে জান্‌বি, এখানকার

লোক নয়। কত লোক হুজুগে মেতে এসে আবার যে পালিয়ে যায়, উহাই তার কারণ। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন, দিন রাত অর্থ অর্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সব লোকে এখানকার ভাব কখনও বুঝতে পার্‌বে না, কখনও মঠের লোককে আপনার বলে মনে কর্‌বে না। এখানকার সন্ন্যাসীরা সেকেলে ছাই-মাখা, মাথায় জটা, চিম্‌টে হাতে, ঔষধ দেওয়া সন্ন্যাসীদের মত নয়; তাই লোকে দেখে শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। আমাদের ঠাকুরের চাল চলন, ভাব—সকলই নূতন ধরণের ছিল—তাই আমরাও সব নূতন রকমের; কখনও সেজে গুজে 'বক্তৃতা' দিই, আবার কখনও 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' বলে ছাই মেখে পাহাড় জঙ্গলে ঘোর তপস্যায় মন দিই!

শুধু সেকেলে পাঁজি পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তর্ তর্ করে এখন দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না করে কেবল পাহাড়ে বসে ধ্যানস্থ থাক্‌লে এখন আর কি চলে? এখন চাই—গীতায় ভগবান্ যা বলেছেন—প্রবল কর্ম্মযোগ—হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা। তবে ত দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠ্‌বে, নতুবা 'তুমি যে তিমিরে', তারাও সেই তিমিরে।

বেলা প্রায় অবসান। স্বামিজী গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণোপযোগী সাজ

করিয়া নীচে নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া পূর্ব্বদিকে এখন যেখানে পোস্তা গাঁথা হইয়াছে, সেখানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন। পরে বজ্‌রাখানি ঘাটে আনা হইলে, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, নিত্যানন্দ ও শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া স্বামিজী ছাতে বসিলে, শিষ্য তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া কল কল শব্দ করিতেছে, মৃদুল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, আকাশের পশ্চিমদিক্ এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই—ভগবান্ মরীচিমালী অস্ত যাইতে এখনও অৰ্দ্ধঘণ্টা বাকী। নৌকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। স্বামিজীর মুখে প্রফুল্লতা, নয়নে কোমলতা, কথায় উদাসীনতা এবং প্রতি হাবভাবে জিতেন্দ্রিয়তা, অভিব্যক্ত হইতেছে!—সে এক ভাবপূর্ণরূপ, যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান অসম্ভব।

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া নৌকা অনুকূল বায়ুবশে আরও উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী দেখিয়া শিষ্য ও অপর সন্ন্যাসিদ্বয় প্রণাম করিল। স্বামিজী কিন্তু কি এক গভীর ভাবে আত্মহারা হইয়া এলোথেলো ভাবে বসিয়া রহিলেন। শিষ্য ও সন্ন্যাসীরা পরস্পরে দক্ষিণেশ্বরের কত কথা বলিতে লাগিল, সে সকল কথা যেন স্বামিজীর কর্ণে প্রবিষ্টই হইল না; দেখিতে দেখিতে নৌকা পেনেটীর দিকে অগ্রসর হইল। পেনেটীতে ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাটীর ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধা হইল। এই বাগানখানিই ইতিপূর্ব্বে একবার মঠের জন্য ভাড়া করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বামিজী অবতরণ করিয়া

বাগান ও বাটী বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—'বাগানটি বেশ, কিন্তু কল্‌কাতা থেকে অনেক দূর ; ঠাকুরের শিষ্যদের যেতে আস্‌তে কষ্ট হত ; এখানে মঠ যে হয় নি, তা ভালই হয়েছে।'

এইবার নৌকা আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে পুনরায় মঠে উপস্থিত হইল।

নবম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে

বিষয়

স্বামিজীর নাগ মহাশয়ের সহিত মিলন—পরস্পরের সম্বন্ধে উভয়ের উচ্চ ধারণা।

শিষ্য অদ্য নাগ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে।

স্বামিজী। (নাগ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন ত?

নাগ মহাশয়। আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব দর্শন হল।

কথাগুলি বলিয়া জোড় হস্ত করিয়া নাগ মহাশয় দণ্ডায়মান রহিলেন।

স্বামিজী। শরীর কেমন আছে?

নাগ মহাশয়। ছাই হাড় মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম।

ঐরূপ বলিয়া নাগ মহাশয় স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

স্বামিজী। (নাগ মহাশয়কে তুলিয়া) ও কি কচ্ছেন?

নাগ মঃ। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্ছি—আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ্ছিস্—ঠিক ভক্তিতে

মানুষ কেমন হয়! নাগ মহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন, দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে। এমনটি আর দেখা যায় না। (প্রেমানন্দ স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ মহাশয়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে আয়।

নাগ মঃ। প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামিজীর প্রতি করজোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।

মঠে বালব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আজ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। নাগ মহাশয়ের শুভাগমনে আজ তোমাদের পাঠ বন্ধ থাকিল।" সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ মহাশয়ের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল। স্বামিজীও নাগ মহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন।

স্বামিজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস্! নাগ মহাশয়কে দেখ; ইনি গেরস্ত; কিন্তু জগৎ আছে কি নেই, এঁর সে জ্ঞান নেই; সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে আছেন! (নাগ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারী ও আমা-দিগকে ঠাকুরের কিছু কথা শুনান।

নাগ মঃ। ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি বল্‌ব? আমি আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝ্‌বে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মর্‌লুম্।

নাগ মঃ। ছিঃ! ওকথা কি বল্‌ছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এপিঠ্ আর ওপিঠ্; যার চোখ আছে, সে দেখুক।

স্বামিজী। এ সব যে মঠ ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে?

নাগ মঃ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগ মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ মহাশয় উন্মাদের মত হইলেন, স্বামিজী সকলকে বলিলেন "যাতে এঁর কষ্ট হয়, তা করো না"; শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন।

স্বামিজী। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা সব শিখ্‌বে।

নাগ মঃ। ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বল্লেন, 'গৃহেই থেকো।' তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্য হয়ে যাই।

স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগ মহাশয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন—"এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে, কাশী হয়ে যাবে সে অদৃষ্ট আমার হবে কি?"

স্বামিজী। আমার ত ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ মঃ। আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝ্‌বে? দিব্য দৃষ্টি না খুল্‌লে চিন্‌বার যো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝ্‌তে পারে নি।

স্বামিজী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—

মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে —সাড়া নেই—শব্দ নেই। সনাতন ধর্ম্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পাল্লে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছেটা আছে—মুক্তি ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

নাগ মঃ। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাহাকেও দেখি না ; যা ইচ্ছা কর্‌বেন—তাই হবে।

স্বামিজী। কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগ মঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে ; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ ! জয় রামকৃষ্ণ !

স্বামিজী। কাজ কর্‌তে মজবুত শরীর চাই ; এই দেখুন, এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই ; ওদেশে (ইউরোপে, আমেরিকায়) বেশ ছিলুম।

নাগ মঃ। শরীর ধারণ কল্লেই—ঠাকুর বল্‌তেন—"ঘরের টেক্স দিতে হয়।" রোগ শোক সেই টেক্স। আপনি যে মোহরের বাক্স ; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই ; কে কর্‌বে ? কে বুঝ্‌বে ? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ ! জয় রামকৃষ্ণ !

স্বামিজী। মঠের এরা আমায় খুব যত্নে রাখে।

নাগ মঃ। যাঁরা কর্‌ছেন, তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার কম্‌তি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামিজী। নাগ মহাশয়! কি যে করছি, কি না করছি—কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মত কাজ করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

নাগ মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন—"চাবি দেওয়া রইল।" তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

স্বামিজী একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগ মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। নাগ মহাশয় দুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া, 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পাইচারী করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে স্বামিজী একখানি কোদাল লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্ব্বপারে মাটী কাটিতেছিলেন—নাগ মহাশয় দর্শনমাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"আমরা থাকতে আপনি ও কি করেন? স্বামিজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন। স্বামিজী একজন শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুনলুম, নাগ মহাশয় চার পাঁচ দিন উপোস করে তাঁর কলকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন; আমি, হরি ভাই ও আর কে একজন মিলে ত নাগ মহাশয়ের কুটিরে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠলেন। আমি বল্লুম, আপনার এখানে আজ ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগ মহাশয় বাজার থেকে চাল,

হাঁড়ী, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধতে সুরু করলেন। আমরা মনে করেছিলুম— আমরাও খাব, নাগ মহাশয়কেও খাওয়াব। রান্না বান্না করে ত আমাদের দেওয়া হল; আমরা নাগ মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বস্‌লুম। আহারের পর, ওঁকে খেতে যাই অনুরোধ করা, আর তখনি ভাতের হাঁড়ী ভেঙ্গে ফেলে কপালে আঘাত করে বল্‌তে লাগলেন, 'যে দেহে ভগবান্ লাভ হল না, সে দেহকে আবার আহার দিব?' আমরা ত দেখেই অবাক্! অনেক করে, পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে এলুম।"

স্বামিজী। নাগ মহাশয় আজ মঠে থাকবেন কি?

শিষ্য। না; ওঁর কি কাজ আছে; আজই যেতে হবে।

স্বামিজী। তবে নৌকা দেখ্। সন্ধ্যা হয়ে এল।

নৌকা আসিলে, শিষ্য ও নাগ মহাশয় স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন।

দশম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বিষয়

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া ও জীবের স্বরূপ—সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া ঈশ্বরকে ধারণা করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়া ক্রমে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে—"অহং ব্রহ্ম," এইরূপ বোধ না হইলে মুক্তি নাই—কামকাঞ্চনভোগস্পৃহা ত্যাগ না হইলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ না হইলে উহা হয় না। অন্তর্ব্বহিঃসন্ন্যাসে আত্মজ্ঞান লাভ—'মেদাটে ভাব' ত্যাগ করা—কিরূপ চিন্তায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়—মনের স্বরূপ ও মনঃসংযম কিরূপে করিতে হয়—জ্ঞানপথের পথিক আপনার যথার্থ স্বরূপকেই ধ্যানের বিষয়রূপে অবলম্বন করিবে—অদ্বৈতাবস্থালাভে অনুভব—জ্ঞান, ভক্তি, যোগরূপ সকল পথের লক্ষ্যই জীবকে ব্রহ্মজ্ঞ করা—অবতার তত্ত্ব—আত্মজ্ঞানলাভে উৎসাহ প্রদান—আত্মজ্ঞ পুরুষের কর্ম্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়।

এখন স্বামিজী বেশ সুস্থ আছেন। শিষ্য রবিবার প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর পাদ-পদ্ম দর্শনান্তে সে নীচে আসিয়া স্বামী নির্ম্মলানন্দের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। এমন সময়ে স্বামিজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, "কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল?"

শিষ্য। মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন, "বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল তোর স্বামিজী আর তুই বুঝিস্। আমরা কিন্তু জানি—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।"

স্বামিজী। তুই কি বল্লি ?

শিষ্য। আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মাত্র। তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী; বাহিরে কিন্তু দ্বৈতবাদীর পক্ষ লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে বেদান্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় "বৈষ্ণব" বলিলেই আমি ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই।

স্বামিজী। তুলসী তোকে ভালবাসে কিনা, তাই ঐরূপ বলে তোকে খ্যাপায়। তুই চট্‌বি কেন? তুইও বল্‌বি, "আপনি শূন্যবাদী নাস্তিক।"

শিষ্য। মহাশয়, উপনিষৎ দর্শনাদিতে ঈশ্বর যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে কি? লোকে কিন্তু, ঐরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্।

স্বামিজী। সর্ব্বেশ্বর কখনও ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যষ্টি; আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল; ঈশ্বর, বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত করে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভিতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্ত্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশ ভাগ হয় না। বোঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ

ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র "ঈশ্বর" বলে নির্দ্দেশ করেছে। অপর ত্রিপাদ, কূটস্থ, যাতে কোনরূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই ব্রহ্ম। তা বলে এরূপ যেন মনে করিস্‌নি ব্রহ্ম জীবজগৎ হতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীব-জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, তাহা নহে; ব্রহ্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হয় নাই। অদ্বৈতবাদী বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে যায়, তখন এক ব্রহ্মই থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয়, আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ প্রত্যক্-চৈতন্য বা ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যান-ধারণায় নামরূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের সার মর্ম্ম। বেদ বেদান্ত শাস্ত্র মাত্র এই কথাই নানা রকমে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

শিষ্য। তাহা হইলে, ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ—একথা আর সত্য হয় কিরূপে?

স্বামিজী। মনরূপ উপাধি নিয়েই মানুষ। মন দিয়েই মানুষকে সকল বিষয় ধর্‌তে বুঝ্‌তে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে

তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এজন্য আপনার personality (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের personality (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা করা জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আদর্শ) টাকে মানুষরূপেই ভাব্‌তে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্কুল জগতে এসে মানুষ দুঃখের ঠেলায় "হা হতোঽস্মি" করে ও এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যাঁর উপর নির্ভর করে সে চিন্তাশূন্য হতে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্ব্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় না। বিবেক বৈরাগ্য এলে, ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে, যে ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতসারে আপনার ভিতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুল্‌ছে। তবে, আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যার Personal Godএ (ঈশ্বরের ব্যক্তিবিশেষত্বে) বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ ভাব ধরেই সাধন ভজন করতে হয়। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের Goal (একমাত্র গম্য বা লভ্য)। তবে নানা পথ—নানা মত। জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান থাকায়; সে হরেক্ রকম সন্দেহ, সংশয়, সুখ, দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু নিজের স্বরূপ লাভে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না "অহং ব্রহ্ম" এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে

ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যুগতির হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। মানুষজন্ম লাভ করে, মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ হলে, তবে মানুষের আত্মজ্ঞান-স্পৃহা বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চনজড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ্‌, ছেলে, ধন মান লাভ করবে বলে মনে যার সঙ্কল্প রয়েছে, তার কি করে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যে সুখ দুঃখ ভালমন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর, স্থির, শান্ত, সমনস্ক, সেই আত্মজ্ঞান লাভে যত্নপর হয়। সেই "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"—মহাবলে জগজ্জাল ছিন্ন করে মায়ার গণ্ডি ভেঙ্গে সিংহের মত বেরিয়ে পড়ে।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, সন্ন্যাস ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারেনা?

স্বামিজী। তা একবার বল্‌তে? অন্তর্ব্বহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন করা চাই। আচার্য্য শঙ্করও উপনিষদের "তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ" এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন—লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন, দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না করে তপস্যা করলে, দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না।* বৈরাগ্য না এলে—ত্যাগ না এলে—ভোগস্পৃহা ত্যাগ না হলে কি কিছু হবার যো আছে?—"সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।"

শিষ্য। কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে ত ত্যাগ আসিতে পারে?

---

* ৩য় মুণ্ডকে, ২য় খণ্ড, ৪ মন্ত্রের ভাষ্য দেখুন।

স্বামিজী। যার ক্রমে আসে, তার আসুক্। তুই তা বলে বসে থাক্‌বি কেন? এখনি খাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বল্‌তেন, "হচ্ছে—হবে ওসব মেদাটে ভাব।" পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাক্‌তে পারে? —না জলের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়? পিপাসা পায়নি তাই বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয় নি, তাই মাগ ছেলে নিয়ে সংসার কচ্ছিস্।

শিষ্য। বাস্তবিক কেন যে এখনও ঐরূপ সর্ব্বস্ব ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহা বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিন্।

স্বামিজী। উদ্দেশ্য ও উপায় সবই তোর হাতে। আমি কেবল Stimulate (ঐ বিষয়ের বাসনা মনে প্রবল) করে দিতে পারি। এই সব সৎশাস্ত্র পড়ছিস্।—এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুদের সেবা ও সঙ্গ কচ্ছিস্—এতেও যদি না ত্যাগের ভাব আসে, তবে জীবনই বৃথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না—কালে এর ফল তেড়েফুঁড়ে বেরুবেই বেরুবে।

শিষ্য অধোমুখে বিষণ্ণভাবে নিজের পরিণাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় স্বামিজীকে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমার মুক্তিলাভের পন্থা খুলিয়া দিন্—আমি যেন এই শরীরেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারি।"

স্বামিজী শিষ্যের অবসন্নতা দর্শন করিয়া বলিলেন, "ভয় কি? সর্ব্বদা বিচার করবি—এই দেহ, গেহ, জীবজগৎ সকলি নিঃশেষ

মিথ্যা—স্বপ্নের মত, সর্ব্বদা ভাব্‌বি এই দেহটা একটা জড় যন্ত্র মাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর যথার্থ স্বরূপ। মনরূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও সূক্ষ্ম আবরণ, তার পর দেহটা তাঁর স্থূল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিষ্কল, নির্ব্বিকার, স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এই সব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায়, তুই তোর স্বস্বরূপকে জান্‌তে পাচ্ছিস্‌ না। এই রূপরসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দ্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মার্‌তে হবে। দেহটা ত স্থূল—এটা মরে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পুঁটুলী—মনটা শীগ্‌গির মরে না। বীজের ন্যায় কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থূল শরীর ধারণ করে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করে! এইরূপ—যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেজন্য বলি, ধ্যান-ধারণা ও বিচারবলে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা মরে গেলেই সব গেল—ব্রহ্মসংস্থ হলি!

শিষ্য। মহাশয়, এই উদ্দাম উন্মত্ত মনকে ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কঠিন।

স্বামিজী। বীরের কাছে আবার কঠিন বলে কোনও জিনিষ আছে? কাপুরুষেরাই ওকথা বলে! "বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ, ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্‌।" অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে মনকে সংযত কর্‌। গীতা বল্‌ছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" চিত্ত হচ্ছে যেন স্বচ্ছ হ্রদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠ্‌ছে, তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক।

ঐ সঙ্কল্পবিকল্প থেকেই বাসনা ওঠে। তার পর, ঐ মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়ে স্থূলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে কার্য্য করে। আবার কর্ম্মও যেমন অনন্ত, কর্ম্মের ফলও তেমনি অনন্ত। সুতরাং অনন্ত, অযুত কর্ম্মফলরূপ তরঙ্গে মন সর্ব্বদা দুল্‌ছে। সেই মনকে বৃত্তিশূন্য করে দিতে হবে —স্বচ্ছ হ্রদে পুনরায় পরিণত কর্‌তে হবে—যাতে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ আর একটীও না থাকে। তবে ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। শাস্ত্রকার ঐ অবস্থারই আভাস এই ভাবে দিচ্ছেন—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি—বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু ধ্যানে ত বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই ?

স্বামিজী। তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্ব্বগ আত্মা—এইটিই মনন ও ধ্যান করবি। আমি দেহ নই—মন নই —বুদ্ধি নই—স্থূল নই—সূক্ষ্ম নই—এইরূপে "নেতি" "নেতি" করে প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ স্বস্বরূপে মনকে ডুবিয়ে দিবি। এইরূপে মন শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেল্‌বি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্বস্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান তখন এক হয়ে যাবে। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এক হয়ে যাবে। নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি হবে। একেই বলে শাস্ত্রে "ত্রিপুটিভেদ"। ঐরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা, তখন তাঁকে আবার জানবি কি করে ? আত্মাই জ্ঞান—আত্মাই চৈতন্য—আত্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলে নির্দ্দেশ করা যায় না, সেই

অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তিপ্রভাবেই জীবরূপী ব্রহ্মের ভেতরে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মানুষ Conscious state (চৈতন্য বা জ্ঞানের অবস্থা) বলে। আর যেখানে এই দ্বৈত সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্ত্বে এক হয়ে যায়, তাকেই শাস্ত্র Superconscious state (সমাধি বা সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা) বলে এইরূপে বর্ণনা করেছেন—"স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্ !"

কথাগুলি, স্বামিজী যেন ব্রহ্মানুভবের অগাধ জলে ডুবিয়া যাইয়াই বলিতে লাগিলেন।

স্বামিজী। এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জানাজানি ভাব থেকেই দর্শন, শাস্ত্র, বিজ্ঞান সব বেরিয়েছে। কিন্তু মানবমনের কোনও ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না! দর্শন-বিজ্ঞানাদি Partial truth (আংশিক ভাবে সত্য)। উহারা সেইজন্য পরমার্থতত্ত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশক) কখনই হতে পারে না। এইজন্য পরমার্থের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে সবই মিথ্যা বলে বোধ হয়—ধর্ম্ম মিথ্যা—কর্ম্ম মিথ্যা—আমি মিথ্যা—তুই মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা। তখনই দেখে যে আমিই সব; আমিই সর্ব্বগত আত্মা; আমার প্রমাণ আমিই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায়? আমি—শাস্ত্রে যেমন বলে—"নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধম্।" আমি ঐ অবস্থা সত্যসত্যই দেখেছি—অনুভূতি করেছি। তোরাও দ্যাখ্—অনুভূতি

কর্—আর জীবকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব শোনাগে। তবে ত শান্তি পা'বি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর বদন গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার মন যেন কোন্ এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"এই সর্ব্বমতগ্রাসিনী, সর্ব্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুভব কর্—আর জগতে প্রচার কর্। উহাতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ সার-কথা বল্লুম; এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই!"

শিষ্য। মহাশয়, আপনি এখন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন; আবার কখনও বা ভক্তির, কখনও কর্ম্মের ও কখনও যোগের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন। উহাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যায়।

স্বামিজী। কি জানিস্?—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য—পরম পুরুষার্থ। তবে মানুষ ত আর সর্ব্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাক্‌তে পারে না? ব্যুত্থানকালে কিছু নিয়ে ত থাক্‌তে হবে? তখন এমন কর্ম্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য তোদের বলি, অভেদবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম্ম কর্। কিন্তু বাবা, কর্ম্মের এমন মার-প্যাঁচ যে, মহামহা সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন! সেই জন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম্ম করতে হয়। গীতায় ঐ কথাই বলেছে। কিন্তু জান্‌বি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের অনুপ্রবেশও নেই। সৎকর্ম্ম দ্বারা বড় জোর চিত্তশুদ্ধি

হয়। এইজন্যই ভাষ্যকার জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম্ম থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। এও একটা উপায় বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। এ কথাটা বেশ করে জেনে রাখ্—বিচারমার্গ ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করা।

শিষ্য। মহাশয়, একবার ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিত্ব বলিয়া আমার জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূর করুন।

স্বামিজী। ঐ সব পথে সাধন কর্‌তে কর্‌তেও কারও কারও ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গ—slow process, দেরীতে ফল হয়—কিন্তু সহজসাধ্য। যোগে নানা বিঘ্ন। হয় ত বিভূতিপথে মন চলে গেল; আর স্বরূপে পৌঁছুতে পার্‌লে না। এক মাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদ এবং সর্ব্বমত-সংস্থাপক বলিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে সমানাদৃত। তবে, বিচারপথে চল্‌তে চল্‌তেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যান বলে উদ্দেশ্যে বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছুতে হবে। এইভাবে সাধন কর্‌লে goalএ (গম্যস্থানে) ঠিক পৌঁছান যায়। এই আমার মতে সহজ পন্থা ও আশুফলপ্রদ।

শিষ্য। এইবার আমায় অবতারবাদ বিষয়ে কিছু বলুন।

স্বামিজী। তুই যে এক দিনেই সব মেরে নিতে চাস!

শিষ্য। মহাশয়, মনের ধাঁধা একদিনে মিটে যায় ত বারবার আর আপনাকে বিরক্ত হইতে হইবে না।

স্বামিজী। যে আত্মার এত মহিমা শাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতারপুরুষ। তাঁরা আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র তফাৎ নেই—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" আত্মাকে ত আর জানা যায় না, কারণ, এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মন্তা হয়ে রয়েছেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। অতএব মানুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্য্যন্ত—যাঁরা আত্মসংস্থ। মানববুদ্ধি ঈশ্বর-সম্বন্ধে Highest ideal (সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব) যা গ্রহণ কর্‌তে পারে, তা ঐ পর্য্যন্ত। তারপর, আর জানাজানি থাকে না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ জগতে জন্মায়। তাঁদের অল্প লোকেই বুঝ্‌তে পারে। তাঁরাই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল—ভবসমূদ্রের আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। কেন বা কি processএ (উপায়ে) হয়, তার নির্ণয় করা যায় না। তবে হয়—হতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-সংস্থ হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে যে স্থলে "অহং" শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা "আত্মপর" বলে জান্‌বি। "মামেকং শরণং ব্রজ" কিনা "আত্মসংস্থ হও।" এই আত্মজ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ

আত্মতত্ত্বলাভের আনুষঙ্গিক অবতারণা। এই আত্মজ্ঞান যাদের হয় না, তারাই আত্মঘাতী। "বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ" রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও ত মানুষ—দুদিনের ছাই-ভস্ম ভোগকে উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বিনি? 'জায়স্ব—ম্রিয়স্বে'র দলে যাবি? 'শ্রেয়ঃ'কে গ্রহণ কর্—'প্রেয়ঃ'কে পরিত্যাগ কর্। এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাল সব্বাইকে বল্‌বি। বল্‌তে বল্‌তে নিজের বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর "তত্ত্বমসি" "সোঽহমস্মি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্ব্বদা উচ্চারণ কর্‌বি ও হৃদয়ে সিংহের মত বল রাখ্‌বি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নররূপী অর্জ্জুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মসংস্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়?—পরে, অর্জ্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মা হয়ে যুদ্ধ কর্‌লেন

শিষ্য। মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কি কর্ম্ম থাকে?

স্বামিজী। জ্ঞানলাভের পর সাধারণে যাকে কর্ম্ম বলে, সেরূপ কর্ম্ম থাকে না। তখন কর্ম্ম "জগদ্ধিতায়" হয়ে দাঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন্ বলন্ সবই জীবের কল্যাণ সাধন করে। ঠাকুরকে দেখেছি—"দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ"—এই ভাব! ঐরূপ পুরুষদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র বলা যায়—"লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।" *

* বেদান্ত সূত্র ২অ; ১পা, ৩৩সূ

একাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

স্বামিজীর কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ দাস গুপ্তের সহিত শিল্প সম্বন্ধে কথোপকথন—কৃত্রিম পদার্থনিচয়ে মনোভাব প্রকাশ করাই শিল্পের লক্ষ্য হওয়া উচিত—ভারতের বৌদ্ধযুগের শিল্প ঐ বিষয়ে জগতে শীর্ষস্থানীয়—ফটোগ্রাফের সহায়তা লাভ করিয়া ইউরোপীশিল্পের ভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে অবনতি—ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পে বিশেষত্ব আছে—জড়বাদী ইউরোপ ও অধ্যাত্মবাদী ভারতের শিল্পে কি বিশেষত্ব আছে—বর্ত্তমান ভারতে শিল্পাবনতি—দেশের সকল বিদ্যা ও ভাবের ভিতরে প্রাণসঞ্চার করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমন।

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রসাদ দাস গুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছে। রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামিজীর গুণগ্রাহী। আলাপ পরিচয়ের পর স্বামিজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। রণদাবাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য জুবিলি আর্ট একাডেমিতে একদিন যাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধায় স্বামিজীর তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামিজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবীর প্রায়

সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদ্‌সাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"মানুষ যে জিনিষটি তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে ideaর (ঐরূপ ভাবের) expression (প্রকাশ) নেই, তাতে রং বেরঙ্গের চাক্‌চিক্য পরিপাটি থাক্‌লেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাবপ্রকাশ করে তৈরী হওয়া উচিত। প্যারিস্ প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখেছিলাম। মূর্ত্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা—Art unveiling nature—অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড়াবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভেতরের রূপসৌন্দর্য্য দেখে। মূর্ত্তিটি এমন ভাবে তৈরী করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ কর্‌তে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ঐ রকমের original (মৌলিক) কিছু কর্‌তে চেষ্টা করবেন।"

রণদাবাবু। আমারও ইচ্ছা আছে সময় মত original modelling (নূতন ভাবের মূর্ত্তি) সব গড়্‌তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ

পাই না। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।

স্বামিজী। আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিষ করতে পারেন, যদি artএ (শিল্পে) একটি ভাবও যথাযথ express (প্রকাশ) করতে পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation (আদর) হবে। খাঁটি জিনিষের কখনও জগতে অনাদর হয় নি। এরূপও শোনা যায়, এক এক জন artist (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর, হয়ত তার appreciation (কার্য্যের আদর) হল!

রণদাবাবু। তা ঠিক। কিন্তু আমরা যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' সাহসে কুলোয় না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হ'ক্ কিছু কৃতকার্য্য হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন উদ্যম বিফল না হয়।

স্বামিজী। যদি ঠিক্ ঠিক্ কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চয় successful (সফলকাম) হবেন। যে, যে বিষয়ে মন প্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success (সফলতা) ত হয়ই—তার পর, চাই কি ঐ কাজের তন্ময়তা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত লাভ হয়। যে কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে, ভগবান তার সহায় হন।

রণদাবাবু। ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাৎ কি দেখ্‌লেন?

স্বামিজী। প্রায় সবই সমান, originality (নূতনত্ব) প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ঐ সব দেশে ফটো যন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁক্‌ছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই originality (নূতন নূতন ভাব প্রকাশের ক্ষমতা) লোপ হয়ে যায়; নিজের ideaর expression দিতে (মনোগত ভাব প্রকাশ কর্‌তে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ আপনাদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বের কর্‌তে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ কর্‌তে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায়, মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক একটা জাতের এক একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, চিত্রে ভাস্কর্য্যে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই ধরুন—ওদেশের গান বাজনা নাচের expression (বাহ্য বিকাশ) গুলি সবই pointed (সূচ্যগ্রের ন্যায় তীব্র); নাচছে যেন হাত পা ছুড়ছে; বাজনাগুলির আওয়াজে কানে যেন সঙ্গীনের খোঁচা দিচ্ছে; গানেরও ঐরূপ। এদেশের নাচ আবার যেন হেলে দুলে তরঙ্গের ন্যায় গড়িয়ে পড়্‌ছে, গানের গমক মূর্চ্ছনাতেও ঐরূপ rounded movement (চক্রাকারের অনুবর্ত্তন) দেখা যায়। বাজ্‌নাতেও তাই। অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়।

যে জাত্‌টা বড় materialistic (জড়বাদী ও ইহকাল-সর্ব্বস্ব) তারা nature (প্রকৃতিগত নামরূপ) টাকেই ideal (চরমোদ্দেশ্য) বলে ধরে ও তদনুরূপ ভাবের expressionই (বিকাশই) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাত্‌টা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব-প্রাপ্তিকেই ideal (জীবনের চরমোদ্দেশ্য) বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই natureএর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের natureই (প্রকৃতিগত সাংসারিক ভাব ও পদার্থনিচয় চিত্রণই) হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাত্‌গুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত কোনও একটা ভাব প্রকাশই) হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চ্চায় অগ্রসর হলেও, ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই আপন আপন ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ওসব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক একটি মূর্ত্তি দেখ্‌লে আপনাকে এই জড়প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেল্‌বে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশকল্পে ভাস্করগণের আর

চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের 'আর্ট-স্কুলের ছবিগুলিতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্যধ্যেয় মূর্ত্তি-গুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃ-প্রকাশ) দিয়ে আঁক্‌বার চেষ্টা কর্‌লে ভাল হয়।

রণদাবাবু। আপনার কথায় হৃদয়ে মহা উৎসাহ হয়। চেষ্টা করে দেখ্‌ব—আপনার কথামত কার্য্য কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

স্বামিজী আবার বলিতে লাগিলেন, "এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির সমাবেশ। ঐ ছবির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক্ ঠিক্ expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দূরে যাক্—ঐ উভয় ভাবের একটাও চিত্রে ঠিক্ ঠিক্ বিকাশ করতে কারুর চেষ্টা নেই! আমি মা কালীর ভীমামূর্ত্তির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' (জগন্মাতা কালী) নামক আমার ইংরাজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ কর্‌তে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে express (প্রকাশ) কর্‌তে পারেন কি?

রণদাবাবু। কি ভাব?

স্বামিজী শিষ্যের পানে তাকাইয়া, তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামিজী উহা ("The stars are blotted out" &c.) রণদাবাবুকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর ঐ কবিতাটি পাঠের সময় শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্ত্তি তাহার কল্পনা-সমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাবুও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া "বাপ্" বলিয়া ভীত-চকিত নয়নে স্বামিজীর মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামিজী। কেমন, এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন ত?

রণদাবাবু। আজ্ঞে, চেষ্টা করব।* কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা করতেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামিজী। ছবিখানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। তার পর আমি উহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করতে বা যা যা দরকার, তা আপনাকে বলে দেব।

অতঃপর স্বামিজী রামকৃষ্ণমিশনের শিলমোহরের জন্য কমলদল-বিকশিত হ্রদমধ্যে হংসরাজিত সর্প-পরিবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া, তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্ম্মপরিগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, স্বামিজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী বুঝাইয়া দিলেন, চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্ম্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্য্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্র মধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব, কর্ম্ম, ভক্তি

* শিষ্য তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তাহার জানা আছে, রণদাবাবু বাড়ী ফিরিয়া পরদিন হইতেই ঐ প্রলয়তাণ্ডবোন্মত্ত চণ্ডীমূর্ত্তি আঁকিতে আরম্ভ করেন। আজিও সেই অর্দ্ধ অঙ্কিত মূর্ত্তিখানি রণদাবাবুর আর্টস্কুলে রহিয়াছে। কিন্তু স্বামিজীকে তাহা আর দেখান হয় নাই।

ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই, পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলা-বিদ্যা শিখিতে পারিলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হইতে পারিত।"

অতঃপর স্বামিজী, ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির যে ভাবে নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, তাহারই একখানি চিত্র (drawing) আনাইলেন। চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামিজীর পরামর্শমত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রখানি রণদা-বাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন—'এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্ম্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দির নির্ম্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। বহু-সংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। উহার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাক্‌বে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যান জপ কর্‌তে পারে, নাট-মন্দিরটি এমন বড় করে নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুল্‌তে হবে যে, দূর থেকে দেখ্‌লে ঠিক ওঁকার বলে ধারণা হবে। মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্ত্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এই ভাবে থাক্‌বে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাট্‌ছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও

মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে ; এখন জীবনে কুলোয় ত কার্য্যে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কার্য্যে পরিণত করতে পারে ত করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন, দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেজন্য ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি সমস্তই যাতে এই মঠ-কেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমন ভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহায় হন।

রণদাবাবু ও উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামিজীর কথাগুলি শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। যাঁহার মহৎ উদার মন, সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামিজীর মহত্ত্বের কথা ভাবিয়া, সকলে একটা অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়া স্তব্ধীভূত হইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে স্বামিজী আবার বলিলেন, "আপনি শিল্পবিদ্যার যথার্থ আলোচনা করেন বলেই, আজ ঐ সম্বন্ধে এত চর্চ্চা হচ্ছে। শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা করে আপনি ঐ বিষয়ের যা কিছু সার ও সর্ব্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।

রণদাবাবু। মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোক ফুটিয়ে দিলেন। শিল্পসম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনি নি। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার নিকট যে সকল ভাব পেলাম, তা যেন কার্য্যে পরিণত করতে পারি।

অতঃপর স্বামিজী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতস্তত: বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিলেন, "ছেলেটি খুব তেজস্বী।"

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

স্বামিজী শিষ্যের ঐ কথার কোনও উত্তর না করিয়া, আপন মনে গুন গুন করিয়া ঠাকুরের একটি গান গাহিতে লাগিলেন— "পরম ধন সে পরশমণি" ইত্যাদি।

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামিজী মুখ ধুইয়া শিষ্য-সমভিব্যাহারে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং Encyclopædia Britannica পুস্তকের শিল্পসম্বন্ধীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে, পূর্ব্ববঙ্গের কথা এবং উচ্চারণের ঢং লইয়া শিষ্যের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

স্বামিজীর শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিসঞ্চার—পূর্ব্ববঙ্গের কথা—নাগ মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্যস্বীকার—আচার ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা—কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগে আত্মদর্শন।

স্বামিজী কয়েকদিন হইল, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়া মঠের উপর তলায় স্বামিজীর কাছে গিয়া প্রণাম করিল। শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও স্বামিজীর হাস্যবদন ও স্নেহমাখা দৃষ্টি, যাহাতে সকলকে সকল দুঃখ ভুলাইয়া আত্মহারা করিয়া দিত!

শিষ্য। স্বামিজী, কেমন আছেন?

স্বামিজী। আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ ত দিন দিন অচল হচ্ছে। বাঙ্গালাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের physique (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে যে কটা দিন দেহ আছে, তোদের জন্য খাট্‌ব। খাট্‌তে খাট্‌তে মর্‌ব।

শিষ্য। আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া

থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামিজী। বসে থাক্‌বার যো আছে কি বাবা! ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখ্‌বার দু তিন দিন আগে সেইটে, এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক্ ওদিক্ কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—স্থির হয়ে থাকতে দেয় না! আপনার সুখের দিক দেখতে দেয় না।

শিষ্য। শক্তি প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলিতেছেন?

স্বামিজী। না রে; ঠাকুরের দেহ যাবার তিন চার দিন আগে, তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাক্‌লেন। আর সাম্‌নে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়্‌লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ electric shockএর মত (তড়িৎ-কম্পনের মত) এসে আমার শরীরে ঢুক্‌ছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! কতক্ষণ এরূপ ভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্য চেতনা হল, দেখি—ঠাকুর কাঁদ্‌ছেন। জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর সস্নেহে বল্‌লেন,—"আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে তবে ফিরে যাবি।" আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ কাজে সে কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাক্‌বার জন্য আমার এদেহ হয় নি।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল,—এ সকল কথা সাধারণ লোকে কি ভাবে বুঝিবে, কে জানে! অনন্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল,—"মহাশয়, আমাদের বাঙাল দেশ (পূর্ব্ববঙ্গ) আপনার কেমন লাগিল?"

স্বামিজী। দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখ্‌লুম খুব শস্য ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। ব্রহ্মপুত্র valleyর (উপত্যকার) শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্ম্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ মাংসটা খুব খায়। যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া দাওয়াতে খুব তেল চর্ব্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল চর্ব্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।

শিষ্য। ধর্ম্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামিজী। ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে দেখ্‌লুম—দেশের লোকগুলো বড় conservative (প্রাচীন প্রথার অনুগামী, অনুদার), উদারভাবে ধর্ম্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic (কাণ্ডজ্ঞানরহিত আত্মমত-পোষণকারী) হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে, একখানা কার photo এনে আমায় দেখালে ও বল্লে, "মহাশয়, বলুন ইনি কে? অবতার কি না?" আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌লুম, "তা বাবা, আমি কি জানি।" তিন চার বার বল্লেও, সে ছেলেটি দেখ্‌লুম, কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য

হয়ে বল্‌তে হল,—"বাবা, এখন থেকে ভাল করে খেয়ো দেয়ো; তা হলে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে—পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।" একথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি করব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বল্‌লে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য। আমাদের পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আজকাল অনেক অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে।

স্বামিজী। গুরুকে লোকে অবতার বল্‌তে পারে; যা ইচ্ছা, তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন—যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুন্‌লাম, তিন চারটি অবতার দাঁড়িয়েছে।

শিষ্য। ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন?

স্বামিজী। মেয়েরা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় বেশী দেখ্‌লুম। হ—র স্ত্রীকে খুব intelligent (বুদ্ধিমতী) বলে বোধ হল। সে খুব যত্ন করে আমায় রেঁধে খাবার পাঠিয়ে দিত।

শিষ্য। শুনিলাম, নাগ মহাশয়ের বাড়ী নাকি গিয়াছিলেন?

স্বামিজী। হাঁ, অমন মহাপুরুষ—এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখ্‌ব না? নাগ মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন। বাড়ীখানি কি মনোরম! যেন শান্তি-আশ্রম। ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নেয়েছিলুম। তারপর,

এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২॥০টা। আমার জীবনে যে কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ মহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ মহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখ্‌লুম। তাঁর সমাধি স্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও, যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নি।

শিষ্য। মহাশয়, নাগ মহাশয়কে ওদেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে নাই।

স্বামিজী। ওসব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝ্‌বে? যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধন্য।

শিষ্য। কামাখ্যা গিয়া কি দেখিলেন?

স্বামিজী। শিলং পাহাড়টি অতি সুন্দর। সেখানে Chief Commissioner, Cotton সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"স্বামিজী! ইউরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্ব্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখ্‌তে এসেছেন?" Cotton সাহেবের মত অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেক্‌চার ফেক্‌চার করতে পারি নি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।

শিষ্য। সেখানকার ধর্ম্মভাব কেমন দেখিলেন ?

স্বামিজী। তন্ত্রপ্রধান দেশ; এক 'হঙ্কর' দেবের নাম শুন্‌লুম, যিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুন্‌লুম, তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত ; ঐ 'হঙ্কর' দেব শঙ্করাচার্য্যেরই নামান্তর কি না বুঝ্‌তে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। কিংবা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষ।

অতঃপর শিষ্য বলিল, "মহাশয়, ওদেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ মহাশয়ের মত, আপনাকেও ঠিক্ বুঝিতে পারে নাই।"

স্বামিজী। আমায় বুঝুক্ আর নাই বুঝুক্—এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হবে। যেরূপ চাল্ চলনকে ইদানীং সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও ও অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি। সেটা ক্রমে হবে। সকল সময়ে Capital (রাজধানী) থেকে ক্রমে প্রদেশ সকলে চাল্ চলন আদব কায়দার বিস্তার হয়। ও দেশেও তাই হচ্ছে। যে দেশে নাগ মহাশয়ের মত মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশের আবার ভাবনা ? তাঁর আলোতেই পূর্ব্ব বঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না ; তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন।

স্বামিজী। ওদেশে আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বল্‌ত—ওটা কেন খাবেন ; ওর হাতে কেন খাবেন,

ইত্যাদি। তাই বল্‌তে হত—আমি ত সন্ন্যাসী ফকির লোক—আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্ত্রেই না বল্‌ছে,—"চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি"—তবে অবশ্য বাইরের আচার ভেতরে ধর্ম্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই; শাস্ত্রজ্ঞানটা নিজের জীবনে practical (কার্য্যকরী) করে নেবার জন্য চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি নেঙ্‌ড়ান জলের কথা* শুনেছিস ত? আচার বিচার কেবল মানুষের ভেতরের মহাশক্তি স্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্ব্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধি-নিষেধাত্মক। উদ্দেশ্য হারিয়ে, খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া কর্‌লে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি, উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন। 'অনুভূতি'ই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর্, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্ম-বিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জান্‌বি সর্ব্বৈব বৃথা হল। আর, আচারবর্জ্জিত হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে

---

* পাঁজিতে লেখা থাকে—'এ বৎসর বিশ আড়া জল হবে', কিন্তু পাঁজিখানা নেঙড়ালে, এক ফোঁটা জলও পড়ে না। সেইরূপ, শাস্ত্রে লেখা আছে, 'এইরূপ এইরূপ কর্‌লে ঈশ্বর দর্শন হয়'; তা না করে কেবল শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌লে কিছুই ফল পাওয়া যায় না।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি

পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও, লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে—মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে, আত্মার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ, কো নিষেধঃ?" অতএব, মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি। উহাই জান্‌বি, goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জান্‌বি—উন্নতির test (পরীক্ষক কষ্টিপাথর)। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখ্‌বি কম্‌তি—সে যে মতের, যে পথের লোক হোক্‌না কেন—তার জান্‌বি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জান্‌বি, আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে ত জান্‌বি, জীবন বৃথা। এই অনুভূতি লাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র টাস্ত্র ত ঢের পড়্‌লি। বল্ দিকি, তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে

ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস্। উভয়ই বন্ধন! পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা অবিদ্যার পারে চলে যা।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি; কিন্তু কর্ম্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না।

স্বামিজী। কর্ম্ম ফর্ম্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম করে এই দেহ পেয়েছিস্, একথা যদি সত্য হয়—তবে কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্ম কেটে, তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবন্মুক্ত হবি? জান্‌বি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে রয়েছে। জ্ঞানে কর্ম্মের লেশ মাত্র নেই। তবে যারা জীবন্মুক্ত হয়েও কাজ করে, তারা জান্‌বি, "পরহিতায়" কর্ম্ম করে। তারা ভালমন্দ ফলের দিকে চায় না; কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসারাশ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ "পরহিতায়" কর্ম্ম করা একপ্রকার অসম্ভব জান্‌বি। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ঐ বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে বিদেহ "জনক" হতে চাস্।

শিষ্য। আপনি কৃপা করুন—যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়।

স্বামিজী। ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাক্‌লে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, এ জন্মেই হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্? আত্মজ্ঞান লাভ

পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও, লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে—মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে, আত্মার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ, কো নিষেধঃ?" অতএব, মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি। উহাই জান্‌বি, goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জান্‌বি—উন্নতির test (পরীক্ষক কষ্টিপাথর)। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যেথানে দেখ্‌বি কম্‌তি—সে যে মতের, যে পথের লোক হোক্‌না কেন—তার জান্‌বি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জান্‌বি, আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে ত জান্‌বি, জীবন বৃথা। এই অনুভূতি লাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র টাস্ত্র ত ঢের পড়্‌লি। বল্ দিকি, তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে

ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস্। উভয়ই বন্ধন! পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা অবিদ্যার পারে চলে যা।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি; কিন্তু কর্ম্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না।

স্বামিজী। কর্ম্ম ফর্ম্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম করে এই দেহ পেয়েছিস্, একথা যদি সত্য হয়—তবে কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্ম কেটে, তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবন্মুক্ত হবি? জান্‌বি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে রয়েছে। জ্ঞানে কর্ম্মের লেশ মাত্র নেই। তবে যারা জীবন্মুক্ত হয়েও কাজ করে, তারা জান্‌বি, "পরহিতায়" কর্ম্ম করে। তারা ভালমন্দ ফলের দিকে চায় না; কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসারাশ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ "পরহিতায়" কর্ম্ম করা একপ্রকার অসম্ভব জান্‌বি। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ঐ বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে বিদেহ "জনক" হতে চাস্।

শিষ্য। আপনি কৃপা করুন—যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়।

স্বামিজী। ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাক্‌লে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, এ জন্মেই হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্? আত্মজ্ঞান লাভ

কর্‌বই কর্‌ব ; এতে যে বাধা বিপদ্ সাম্‌নে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ়সংকল্প। মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক্, এ দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা করে এক মনে আপনার Goalএর (উদ্দেশ্যের) দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার ত পশু-পক্ষীরাও কর্‌ছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে—কেবল মাত্র সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। সংসারে সকলে যে পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি ? তবে আর তোর পুরুষকার কি ? সকলে ত মর্‌তে বসেছে। তুই যে মৃত্যু জয় কর্‌তে এসেছিস্। মহাবীরের ন্যায় অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ কর্‌বিনি। কয়দিনের জন্যই বা শরীর ? কয়দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস্, তবে ভিতরের আত্মাকে জাগা আর বল্—আমি অভয় পদ পেয়েছি। বল্—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা ; তার পর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্য্যপ্রদ নির্ভয়বাণী শোনা—"তত্ত্বমসি," "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এইটি হলে তবে জান্‌ব যে তুই যথার্থই একগুঁয়ে বাঙ্গাল।

ত্রয়োদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

স্বামিজীর মনঃসংযম—তাঁহার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের সংকল্প সম্বন্ধে শিষ্যকে বলা—এক চিৎসত্তা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান—প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোকদিগের শাস্ত্রাধিকার কতদূর ছিল—স্ত্রীজাতির সম্মাননা ভিন্ন কোন দেশ বা জাতির উন্নতিলাভ অসম্ভব—তন্ত্রোক্ত বামাচারের দূষিত ভাবই বর্জ্জনীয়; নতুবা স্ত্রীজাতীর সম্মাননা ও পূজা প্রশস্ত ও অনুষ্ঠেয়—ভাবী স্ত্রীমঠের নিয়মাবলী—ঐ মঠে শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীদিগের দ্বারা সমাজের কিরূপ প্রভূত কল্যাণ হইবে—পরব্রহ্মে লিঙ্গভেদ নাই, কেবল 'আমি তুমি'র রাজ্যে বিদ্যমান—অতএব স্ত্রীজাতি ব্রহ্মজ্ঞা হওয়া অসম্ভব নহে—বর্ত্তমান প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় অনেক ত্রুটি থাকিলেও উহা নিন্দনীয় নহে—ধর্ম্মকে শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে—মানবের ভিতর ব্রহ্মবিকাশের সহায়কারী কার্য্যই সৎকার্য্য—বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের অত্যন্ত অভাব থাকিলেও তল্লাভে কর্ম্ম গৌণভাবে সহায়ক হয়; কারণ, কর্ম্ম দ্বারাই মানবের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না।

শনিবার বৈকালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর শরীর তত সুস্থ নহে, শিলং পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া অল্প দিন হইল প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার পা ফুলিয়াছে এবং সমস্ত শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে। স্বামিজীর গুরুভ্রাতৃগণ সেই জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। বউবাজারের শ্রীযুক্ত মহানন্দ কবিরাজ স্বামিজীকে দেখিতেছেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের

অনুরোধে স্বামিজী কবিরাজী ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে নুন, জল বন্ধ করিয়া "বাঁধা" ঔষধ খাইতে হইবে—আজ রবিবার।

শিষ্য বলিল, "মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪।৫ বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে আপনার জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া অসহ্য হইবে।"

স্বামিজী। তুই কি বল্‌ছিস্? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে আর জলপান কর্‌ব না বলে দৃঢ় সংকল্প কর্‌ব, তার পর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন। তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাব্‌তে পার্‌ছেন না। শরীরটা ত মনেরই খোলস্; মন যা বল্‌বে সেইমত ত ওকে চল্‌তে হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা কর্‌তে হল, ওদের (গুরুভ্রাতাদের) অনুরোধ ত আর উপেক্ষা করতে পারিনে।

বেলা প্রায় ১০টা। স্বামিজী উপরেই বসিয়া আছেন। শিষ্যের সঙ্গে প্রসন্নবদনে মেয়েদের জন্য যে ভাবী মঠ করিবেন, তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; বলিতেছেন, "মাকে কেন্দ্রস্থানীয়া করে গঙ্গার পূর্ব্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন কর্‌তে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু সব তৈরী হবে, ওপারের মেয়েদের মঠেও তেম্‌নি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী সব তৈরী হবে।"

শিষ্য। মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বকালে মেয়েদের জন্য ত কোন মঠের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধযুগেই স্ত্রী-মঠের কথা শুনা যায়। কিন্তু উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল; ঘোর বামাচারে দেশ পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল।

স্বামিজী। এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে ত বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্ব্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি? স্মৃতি ফৃতি লিখে, নিয়ম নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের এখন না তুল্‌লে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?

শিষ্য। মহাশয়, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মূর্ত্তি। মানুষের অধঃপতনের জন্যই যেন উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রীজাতিই মায়া দ্বারা মানবের জ্ঞানবৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—উহাদের জ্ঞান-ভক্তি কখনও হইবে না।

স্বামিজী। কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হল ভট্‌চায্ বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদ পাঠের অনধিকারী বলে নির্দ্দেশ কর্‌লে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে, দেখ্‌তে পাবি মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া

স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এই সব আদর্শ-স্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাক্‌বে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে—যে জাতে—মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ—সে জাত কখনও বড় হতে পারে নি, কস্মিন্‌কালে পার্‌বেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা! মনু বলেছেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥" (মনু—৩।৫৬) যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নেই। এই জন্য এদের আগে তুল্‌তে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি ষ্টার থিয়েটারে বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন আবার তন্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া আপনার কথা আপনিই যে বদলাইতেছেন।

স্বামিজী। তন্ত্রের বামাচার মতটা পরিবর্ত্তিত হয়ে এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের অথবা ঠিক্ ঠিক্ বামাচারেরও নিন্দা করি নি। ভগবতী জ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দূষিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রয়েছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দ্বারা influenced (ভাবিত) হয়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম—এখনও ত তা করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যাদি আন্তর-বিকাশে আবার, মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ, সিদ্ধসংকল্প, ব্রহ্মজ্ঞ করে দিচ্ছে—সেই মাতৃ-রূপিণীর স্ফুরদ্বিগ্রহস্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কখনই নিষেধ করি নি। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"—এই মহামায়াকে পূজা, প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না কর্‌তে পার্‌লে সাধ্য কি ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্য্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হয়ে যান? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিকাশকল্পে এইজন্য মেয়েদের মঠ করে যাব।

শিষ্য। আপনার উহা উত্তম সংকল্প হইতে পারে, কিন্তু মেয়ে কোথায় পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের স্ত্রী-মঠে যাইতে অনুমতি দিবে?

স্বামিজী। কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) হয়ে বস্‌বেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের স্ত্রী-কন্যারা উহাতে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর, তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্য্যের সহায় হবে।

শিষ্য। ঠাকুরের ভক্তেরা এ কার্য্যে অবশ্যই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্য্যের সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামিজী। জগতের কোন মহৎ কার্য্যই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয় নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে, কালে উহা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন ত এইরূপে মঠ স্থাপন করব। পরে দেখ্‌বি, এক আধ generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের লোক বুঝ্‌তে পারবে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এই কাজে জীবনপাত করে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল লোকের সাম্‌নে ধর্‌। দেখ্‌বি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে।

শিষ্য। মহাশয়, মেয়েদের জন্য কিরূপ মঠ করিতে চাহেন,

তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।

স্বামিজী। গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাক্‌বে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাক্‌বে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান কর্‌তে পারে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্য্যভার চালাবে! স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাক্‌বে; তাতে ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—অল্প বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখান হবে। আর, জপ, ধ্যান, পূজা এসব ত শিক্ষার অঙ্গ থাক্‌বেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাক্‌তে পার্‌বে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পার্‌বে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীস্বরূপে এসে পড়াশুনা কর্‌তে পার্‌বে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাক্‌তে ও যতদিন থাক্‌বে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পার্‌বে। যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে অভিভাবক-দের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারীব্রতাবলম্বনে

অবস্থান করতে পার্‌বে। যারা চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন কর্‌বে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন কর্‌বে। চরিত্রবতী, ধর্ম্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। স্ত্রী-মঠের সংস্রবে যতদিন থাক্‌বে, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা এ মঠেরও ভিত্তিস্বরূপ হবে। ধর্ম্ম-পরতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখ্‌লে কে তাদের না সম্মান কর্‌বে— কেই বা তাদের অবিশ্বাস কর্‌বে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত হলে তবে ত তোদের দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝ্‌তে পারতিস্। মেয়েদের ঐ দুর্দ্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার, দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বল্‌ছি, কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদ বেদান্ত মুখস্থ করে?

শিষ্য। মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়েরা বিবাহ করে, তবে আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন

করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না?

স্বামিজী। তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তার পর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় কর্‌বে। বে করে সংসারী হলেও ঐরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিবে ও বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ কর্‌তে পার্‌বে না—এ নিয়ম রাখতে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, তাহা হইলে সমাজে ঐ সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।

স্বামিজী। কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝ্‌তে পারিস্‌ নি। এই সব বিদুষী ও কর্ম্মতৎপরা মেয়েদের বরের অভাব হবে না। "দশমে কন্যকাপ্রাপ্তিঃ" সে সব বচনে এখন সমাজ চল্‌ছে না—চল্‌বেও না। এখনি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে?

শিষ্য। যাহাই বলুন, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে।

স্বামিজী। তা হোক্‌ না, তাতে ভয় কি? সৎসাহসে অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে উঠ্‌বে। যাতে বাধা নেই—প্রতিকূলতা নেই, তাতে মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle (বাধা

বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিস ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামিজী। পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা, "আমি তুমির" planeএ (ভূমিতে) লিঙ্গভেদটা দেখ্‌তে পাই; আবার মন যত অন্তর্মুখ হতে থাকে, ততই ঐ ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে, মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর এ স্ত্রী, ও পুরুষ—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। আমরা ঠাকুরে ঐরূপ প্রত্যক্ষ দেখেছি। তাই বলি, মেয়ে পুরুষে বাহ্য ভেদ থাক্‌লেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে ত স্ত্রীলোক তা হতে পারবে না কেন? তাই বল্‌ছিলুম মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়েমানুষ জেগে উঠ্‌বে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া গেল।

স্বামিজী। এখনি কি খুলেছে? যখন সর্ব্বাবভাসক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন দেখ্‌বি, এই স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে; তখনই মেয়েদের ব্রহ্মরূপিণী বলে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি—স্ত্রী মাত্রেই মাতৃভাব—তা যে জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন! দেখেছি কি না!—তাই এত করে তোদের ঐরূপ

তে বলি ও মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ কর্‌তে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে ত কালে তাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠ্‌বে।

শিষ্য। আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মেয়েরা একটু আধটু পড়িতে ও সেমিজ্ গাউন্ পরিতেই শিখিতেছে, কিন্তু ত্যাগ, সংযম, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী বিষয়ে কতটা উন্নত যে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

স্বামিজী। প্রথম প্রথম অমন্‌টা হয়ে থাকে। দেশে নূতন ideaর (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক্ ঠিক্ গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিন্তু যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষার জন্যও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস্, শিক্ষাই বলিস্ আর দীক্ষাই বলিস্—ধর্ম্মহীন হলে তাতে গলদ্ থাক্‌বেই থাক্‌বে। এখন ধর্ম্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার কর্‌তে হবে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতোদ্‌যাপন এই জন্য শিক্ষার দরকার। বর্ত্তমানকালে এ পর্য্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্ম্মটাকেই

secondary (গৌণ) করে রাখা হয়েছে। তাইতেই তুই যে সব দোষের কথা বল্‌লি, সেগুলি হয়েছে। কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল্? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাদের ঐরূপ বে-চালে পা পড়েছে। সকল সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তককেই অভীপ্সিত কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিতা মেয়েরা কেবল নভেল্ নাটক পড়িয়াই সময় কাটায়; পূর্ব্ববঙ্গে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়াও নানা ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে ঐরূপ করে কি ?

স্বামিজী। ভাল মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কাজ করে লোকের সাম্‌নে example (দৃষ্টান্ত) ধরা। Condemn (নিন্দাবাদ) করে কোন কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়। যে যা বলে বলুক, কাকেও contradict (বিরুদ্ধ তর্ক করে পরাস্ত করতে চেষ্টা) কর্‌বি নি। এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাইতেই দোষ থাক্‌বে—"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ"—আগুন থাক্‌লেই ধূম উঠ্‌বে। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক্‌তে হবে? যতটা পারিস্, ভাল কাজ করে যেতে হবে।

শিষ্য। ভাল কাজটা কি?

স্বামিজী। যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে—আত্মতত্ত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে, ঋষি-প্রচলিত পথে চল্‌লে ঐ আত্মজ্ঞান শীগ্‌গির ফুটে বেরোয়। আর, যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায় বলে নির্দ্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্ম-জন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিস্?—সে তোর সঙ্গে থাক্‌বেই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আচার্য্য শঙ্করের মতে কর্ম্মও জ্ঞানের পরি-পন্থী—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে?

স্বামিজী। আচার্য্য শঙ্কর ঐরূপ বলে, আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্ম্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী, এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় বলে নির্দ্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে, কর্ম্মের অনুপ্রবেশও নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছিনে। ক্রিয়া, কর্ত্তা ও কর্ম্মবোধ যতকাল মানুষের থাক্‌বে, ততকাল সাধ্যি কি, সে কাজ না করে বসে থাকে? অতএব কর্ম্মই যখন জীবের স্বভাব

হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে সব কর্ম্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশ-কল্পে সহায়কারী হয়, সেগুলি কেন করে যা না? কর্ম্ম মাত্রই ভ্রমাত্মক—একথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারকল্পে কর্ম্মের বিশেষ উপযোগিত্ব আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ কর্‌বি, তখন কর্ম্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা কর্‌বি, তাই সৎ কর্ম্ম হবে। তাতে জীবের—জগতের কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হলে তোর শ্বাসপ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্য্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। তখন আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম্ম কর্‌তে হবে না। বুঝলি?

শিষ্য। আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়কারী অতি সুন্দর মীমাংসা।

অনন্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বামিজী শিষ্যকে প্রসাদ পাইতে যাইতে বলিলেন। শিষ্যও স্বামিজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে করযোড়ে বলিল, "মহাশয়, আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদে আমার যেন এ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ হয়।" স্বামিজী শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন "ভয় কি বাবা? তোরা কি আর এ জগতের লোক—না গেরস্ত, না সন্ন্যাসী—এই এক নূতন ঢং।"

* * *

চতুর্দ্দশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

স্বামিজীর ইন্দ্রিয়সংযম, শিষ্যপ্রেম, রন্ধনকুশলতা ও অসাধারণ মেধা—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে তাঁহার মতামত।

স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের বিশেষ অনুরোধে স্বামিজী আজ ৫।৭ দিন যাবৎ কবিরাজী ঔষধ খাইতেছেন। এ ঔষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে।

শিষ্য প্রাতেই মঠে আসিয়াছে। আসিবার কালে একটা রুই মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে। মাছ দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন, "আজ ও মাছ আন্‌তে হয়? একে আজ রবিবার; তার উপর স্বামিজী অসুস্থ—শুধু দুধ খেয়ে আজ ৫।৭ দিন আছেন।" শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া, নীচে মাছ ফেলিয়া, স্বামিজীর পাদপদ্ম-দর্শন মানসে উপরে গেল। স্বামিজী শিষ্যকে দেখিয়া সস্নেহে বলিলেন, "এসেছিস্? ভালই হয়েছে; তোর কথাই ভাবছিলুম।"

শিষ্য। শুনিলাম, শুধু দুধ মাত্র পান করিয়া নাকি আজ পাঁচ সাত দিন আছেন?

স্বামিজী। হাঁ, নিরঞ্জনের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কবিরাজী ঔষধ খেতে হল। ওদের কথা ত এড়াতে পারিনে।

শিষ্য। আপনি ত ঘণ্টায় পাঁচ ছয় বার জল পান করিতেন, কেমন করিয়া একেবারে উহা ত্যাগ করিলেন?

স্বামিজী। যখন শুন্‌লুম—এই ঔষধ খেলে জল খেতে পাব না, তখনি দৃঢ় সঙ্কল্প কর্‌লুম—জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না।

শিষ্য। ঔষধে রোগের উপশম হইতেছে ত?

স্বামিজী। 'উপকার', 'অপকার' জানি নে। গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি।

শিষ্য। দেশী কবিরাজী ঔষধ, বোধ হয়, আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

স্বামিজী। আমার মত কিন্তু একজন Scientific (বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; Lay man (হাতুড়ে), যারা বর্ত্তমান Science এর (শরীর বিজ্ঞানের) কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজি পুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল্ ছুড়ছে, তারা যদি দুচারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্য লাভ আশা করা কিছু নয়।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ স্বামিজীর কাছে আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য একটা বড় মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে, কিন্তু আজ রবিবার, কি করা যাইবে। স্বামিজী বলিলেন, "চল্, কেমন মাছ দেখ্‌ব।"

অনন্তর স্বামিজী একটা গরম জামা পরিলেন ও দীর্ঘ একগাছা যষ্টি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে নীচের তলায় আসিলেন। মাছ দেখিয়া স্বামিজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আজই উত্তম করে মাছ রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে ৺কালীমাতার প্রসাদী মাছ, মাংসও রবিবারে খাইতেন না, সেজন্য মঠে রবিবারে ঠাকুরকে মাছ ভোগ দেওয়া হইত না। স্বামী প্রেমানন্দ ঐ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না যে।" তদুত্তরে স্বামিজী বলিলেন,—"ভক্তের আনীত দ্রব্যে শনিবার, রবিবার নেই। ভোগ দিগে যা।" স্বামী প্রেমানন্দ আর ওজর আপত্তি না করিয়া, স্বামিজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্বেও ঠাকুরকে মৎস্য ভোগ দেওয়া স্থির হইল।

মাছ কাটা হইলে, ঠাকুরের ভোগের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া দিয়া, স্বামিজী ইংরাজী ধরণে রাঁধিবেন বলিয়া কতকটা মাছ নিজে চাহিয়া লইলেন এবং আগুনের তাতে পিপাসার বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মঠের সকলে রাঁধিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া দুধ, ভার্মিসেলি, দধি প্রভৃতি দিয়া চারি পাঁচ প্রকারে ঐ মাছ রাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রসাদ পাইবার সময় স্বামিজী, ঐ সকল মাছের তরকারী আনিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "বাঙ্গাল মৎস্যপ্রিয়। দেখ্ দেখি কেমন রান্না হয়েছে।" ঐ কথা বলিয়া তিনি ঐ সকল ব্যঞ্জনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া, শিষ্যকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হয়েছে? শিষ্য

বলিল, "এমন কখনও খাই নাই।" তাহার প্রতি স্বামিজীর অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই তখন তাহার প্রাণ পূর্ণ! ভার্‌মিসেলি—শিষ্য ইহজন্মে খায় নাই। উহা কি পদার্থ, জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী বলিলেন, "ওগুলি বিলিতি কেঁচো। আমি লণ্ডন থেকে শুকিয়ে এনেছি।" মঠের সন্ন্যাসিগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন; শিষ্য রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল।

কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়া স্বামিজীর এখন আহার নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন, কিন্তু এই অনাহার অনিদ্রাতেও স্বামিজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক দিন হইল, মঠে নূতন Encyclopædia Britannica কেনা হইয়াছে। নূতন ঝক্‌ঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য স্বামিজীকে বলিল, "এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।" শিষ্য তখন জানিত না যে, স্বামিজী ঐ বইগুলির দশ খণ্ড ইতিমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামিজী। কি বল্‌ছিস্? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর্—সব বলে দেব।

শিষ্য অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন?"

স্বামিজী। না পড়্‌লে কি বল্‌ছি?

অনন্তর স্বামিজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য ঐ সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়,---স্বামিজী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম্ম ত বলিলেনই—তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন! শিষ্য ঐ বৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, "ইহা মানুষের শক্তি নয়!"

স্বামিজী। দেখ্‌লি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন ঠিক ঠিক কর্‌তে পার্‌লে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিষ্য। আপনি যাহাই বলুন মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার ফলে এরূপ অমানুষিক শক্তির কথনই স্ফুরণ সম্ভবে না। আরও কিছু চাই।

উত্তরে স্বামিজী আর কিছু বলিলেন না।

অনন্তর স্বামিজী সর্ব্বদর্শনের কঠিন বিষয় সকলের বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। অন্তরে অন্তরে ঐ সিদ্ধান্ত-গুলি প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্যই যেন আজ তিনি ঐগুলি ঐরূপ বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামিজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "তুই ত বেশ! স্বামিজীর অসুস্থ শরীর—কোথায় গল্প সল্প করে স্বামিজীর মন প্রফুল্ল রাখ্‌বি, তা না—তুই কি না ঐ সব জটিল কথা তুলে স্বামিজীকে বকাচ্ছিস্!" শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। কিন্তু স্বামিজী

ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলিলেন, "নে, রেখে দে, তোদের কবিরাজী নিয়ম ফিয়ম্—এরা আমার সন্তান, এদের সদুপদেশ দিতে দিতে আমার দেহটা যায় ত বয়ে গেল।" শিষ্য কিন্তু অতঃপর আর কোন দার্শনিক প্রশ্ন না করিয়া, বাঙ্গালদেশীয় কথা লইয়া হাসি তামাসা করিতে লাগিল। স্বামিজীও শিষ্যের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্যে যোগ দিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর, বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল। ঐ বিষয়ের অল্প স্বল্প যাহা মনে আছে, তাহাই এখানে দিতেছি। প্রথম হইতে স্বামিজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলেন ; এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহসংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-প্রচলন-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ছেলেদের হাতে ঐ সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।" পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন, "ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।"

শিষ্য বলিল, "কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।"

স্বামিজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন কর্‌লেই তোরা তাকে তাড়া করিস্। আগে ভাল করে দেখ্,

লোকটা কি বল্‌ছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগ্‌ল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি —তাকে অপদস্থ কর্‌তে কিনা ছুঁচো বধ কাব্য লেখা হল! তা যত পারিস্ লেখ্‌না, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধর্‌তেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝ্‌বে? এই যে জি, সি, * কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখ্‌ছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise (সমালোচনা) কচ্ছে—দোষ ধর্‌ছে! জি, সি, কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে? পরে লোক ঐ সকল পুস্তক appreciate (আদর) কর্‌বে।

এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন,—"যা, নীচে লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্যখানা নিয়ে আয়।" শিষ্য মঠের লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্য লইয়া আসিলে, বলিলেন, "পড়্ দিকি—কেমন পড়্‌তে জানিস্?"

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে

* স্বামিজী মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে জি, সি, বলিয়া ডাকিতেন।

লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামিজীর মনোমত না হওয়ায়, তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য্য হইল দেখিয়া প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ দিকি—এই কাব্যের কোন অংশটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ?"

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমানা হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে, মহা-বীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা! 'যা হবার হোক্ গে ; আমার কর্ত্তব্য আমি ভুলব না এতে দুনিয়া থাক্, আর যাক্—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।"

এই বলিয়া স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগরূক রহিয়াছে।

পঞ্চদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

আত্মা অতি নিকটে রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার অনুভূতি সহজে হয় না কেন—অজ্ঞানাবস্থা দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হইলে জীবের মনে নানা সন্দেহ প্রশ্নাদি আর উঠে না—স্বামিজীর ধ্যান-তন্ময়তা।

স্বামিজীর এখনও একটু অসুখ আছে। কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুধু দুধ পান করিয়া থাকায় স্বামিজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতিঃ অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

আজ দুইদিন হইল শিষ্য মঠেই আছে। যথাসাধ্য স্বামিজীর সেবা করিতেছে। আজ অমাবস্যা। শিষ্য, নির্ভয়ানন্দ স্বামীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া স্বামিজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

স্বামিজীর পদসেবা করিতে করিতে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, যে আত্মা সৰ্ব্বগ, সৰ্ব্বব্যাপী, অণুপরমাণুতে অনুস্যূত ও জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়া তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতি হয় না কেন?"

স্বামিজী। তোর যে চোক আছে, তা কি তুই জানিস্? যখন

কেহ চোকের কথা বলে, তখন, 'আমার চোক আছে' বলে কতকটা ধারণা হয়; আবার চোকে বালি পড়ে যখন চোক কর্ কর্ করে, তখন চোক যে আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। শাস্ত্র বা গুরুমুখে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোকদুঃখের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, যখন আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে অবলম্বনশূন্য জ্ঞান করে, যখন ভাবী জীবনের দুরতিক্রমনীয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। দুঃখ—আত্মজ্ঞানের অনুকূল, এইজন্য। কিন্তু ধারণা থাকা চাই। দুঃখ পেতে পেতে কুকুর বেড়ালের মত যারা মরে, তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে সেই—যে এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে ঐ সকলকে নশ্বর ধারণা করে আত্মরতিপর হয়। মানুষে ও অন্যজীব-জানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ। যে জিনিষটা যত নিকটে হয় তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অন্তর হতে অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তাঁর সন্ধান পায় না। কিন্তু সমনস্ক শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব, বহির্জগৎ উপেক্ষা করে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করে গৌরবান্বিত হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং "আমিই

সেই আত্মা"—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি বেদের মহাবাক্যসকল প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মহাশয়, এ দুঃখ কষ্ট তাড়নার মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞান লাভের ব্যবস্থা কেন ? সৃষ্টি না হইলেই ত বেশ ছিল। আমরা সকলেই ত এককালে ব্রহ্মে বর্ত্তমান ছিলাম। ব্রহ্মের এইরূপ সিসৃক্ষাই বা কেন ? আর এই দ্বন্দ্ব-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের এই জন্ম-মরণ-সঙ্কুল পথে গতাগতিই বা কেন ?

স্বামিজী। লোকে মাতাল হলে কত খেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা যখন ছুটে যায়, তখন সেগুলো মাথার ভুল বলে বুঝ্‌তে পারে। অনাদি অথচ সান্ত এই অজ্ঞান-বিলসিত সৃষ্টি ফৃষ্টি যা কিছু দেখ্‌ছিস্‌, সেটা তোর মাতাল অবস্থার কথা ; নেশা ছুটে গেলে, তোর ঐ সব প্রশ্নই থাক্‌বে না।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি সৃষ্টি-স্থিত্যাদি কিছুই নাই ?

স্বামিজী। থাক্‌বে না কেন রে ? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে 'আমি আমি' কচ্ছিস্‌, ততক্ষণ এ সবই আছে। আর যখন তুই বিদেহ, আত্মরতি, আত্মক্রীড়—তখন তোর পক্ষে এ সব কিছু থাক্‌বে না ; সৃষ্টি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি আছে কি না—এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাক্‌বে না। তখন তোকে বল্‌তে হবে—

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্‌ ॥

শিষ্য। জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে, "কুত্র লীনমিদং জগৎ" কথাই বা কিরূপে বলা যেতে পারে ?

স্বামিজী। ভাষায় ঐ ভাবটা প্রকাশ করে বোঝাতে হচ্ছে, তাই ঐরূপ বলা হয়েছে। যেথানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার নেই, সেই অবস্থাটা ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করতে গ্রন্থকার চেষ্টা করছেন, তাই জগৎ কথাটা যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা ব্যবহারিকরূপেই বলেছেন; পারমার্থিক সত্তা জগতের নেই; সে কেবল মাত্র "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌" ব্রহ্মের আছে। বল্‌, তোর আর কি বল্‌বার আছে। আজ তোর তর্ক নিরস্ত করে দেবো।

ঠাকুরঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে চলিলেন। শিষ্য স্বামিজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "ঠাকুরঘরে গেলিনি ?"

শিষ্য। আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে।

স্বামিজী। তবে থাক্‌।

কিছুকাল পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,— "আজ অমাবস্যা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। আজ কালীপূজার দিন।"

স্বামিজী শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া, জানালা দিয়া পূর্ব্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্‌, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা!'—বলিয়া সেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরঘরে ভক্তগণ-পঠিত

শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব মাত্র শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামিজীর এই অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য এবং গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে বহিঃ-প্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থিরভাব দেখিয়া শিষ্যের মন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামিজী আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিলেন, "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি" ইত্যাদি।

গীত সাঙ্গ হইলে, স্বামিজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা', 'কালী' 'কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে তখন আর কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামিজীর আজ্ঞা পালনের জন্য সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

স্বামিজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন কোন এক দূরদেশে এখনও অবস্থান করিতেছেন। চঞ্চল শিষ্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়া বলিল,—"মহাশয়, এইবার কথাবার্ত্তা কহুন।"

স্বামিজী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াই যেন মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন, "যাঁর লীলা এত মধুর, সেই আত্মার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কত দূর, বল্ দিকি?" শিষ্য তখনও তাঁহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক অপগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, ও সব কথায় এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালীপূজার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।"

স্বামিজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া গান ধরিলেন,—

"কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী" ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন, "এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব'— শুনিস্ নি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামিজী। এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো কর্‌ব! রঘুনন্দন বলেছেন, "নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্"— এবার তাই কর্‌ব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে— মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহালয়ে, মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামিজী শুনিয়া বলিলেন, "যা নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগ্‌গীর আসিস্"। শিষ্য নীচে গেল।

ষোড়শ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া স্বামিজীর চিত্তে অব-
।—বর্ত্তমান কালে দেশে কিরূপ আদর্শের আদর হওয়া কল্যাণকর—মহা-
রের আদর্শ—দেশে বীরের কঠোরপ্রাণতার উপযোগী সকল বিষয়ের আদর
লন করিতে হইবে—সকল প্রকার দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিতে হইবে—
মিজীর বাক্যের অদ্ভুত শক্তির দৃষ্টান্ত—লোককে শিক্ষা দিবার জন্য শিষ্যকে
ৎসাহিত করা–সকলের মুক্তি না হইলে ব্যষ্টির মুক্তি নাই এই মতের
লোচনা ও প্রতিবাদ—ধারাবাহিক কল্যাণ-চিন্তা দ্বারা জগতের কল্যাণ
রা।

স্বামিজী আজকাল মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শরীর তত সুস্থ হে; তবে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন। শিষ্য আজ, নিবার, মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া, তাঁহার শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে।

স্বামিজী। এ শরীরের ত এই অবস্থা। তোরা ত কেহই আমার কাজে সহায়তা কর্‌তে অগ্রসর হচ্ছিস্ না। আমি একা কি কর্‌ব বল? বাঙ্গালা দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী কাজ কর্ম্ম চল্‌তে পারে? তোরা সব এখানে আসিস্—

শুদ্ধাধার, তোরা যদি আমার এই সব কাজে সহায় না হস্ত আমি একা কি কর্‌ব বল ?

শিষ্য। মহাশয়, এই সকল ব্রহ্মচারী ত্যাগী, পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—আমার মনে হয়, আপনার কার্য্যে ইঁহারা প্রত্যেকে জীবন দিতে পারেন—তথাচ আপনি ঐ কথা বলিতেছেন কেন ?

স্বামিজী। কি জানিস্ ? আমি চাই—A band of young Bengal (একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে), এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা। আমার idea (ভাব) সকল যারা work out (জীবনে পরিণত) করে আপনাদের ও দেশের কল্যাণ সাধনে জীবনপাত কর্‌তে পার্‌বে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আস্‌ছে ও আস্‌বে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ—হৃদয় উদ্যমশূন্য—শরীর অপটু—মন সাহস শূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয় ? নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান দশবারটি ছেলে পেলে, আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।

শিষ্য। মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না ?

স্বামিজী। যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে করে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান, যশ,

ধন উপার্জ্জনের চেষ্টাতে বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অপটু। তার পর, বাকী অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও ত কার্য্যক্ষেত্রে সে সকল এখনও বিকাশ করতে পাচ্ছিস্ না। এই সব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীর ধারণ করে কোন কাজই করে যেতে পাল্লুম না। অবশ্য এখনও একেবারে হতাশ হই নি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হলে এই সব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর বেরুতে পারে —যারা ভবিষ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ করবে।

শিষ্য। আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাবসকল সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটি আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তা প্রবাহ ছুটিয়াছে!—কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চ্চা, কি ব্রহ্মচর্য্য—সর্ব্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া, উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর, দেশের লোকে, কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ ও সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

স্বামিজী। আমার নাম না কর্‌লে, তাতে কি আর আসে যায়? আমার idea (ভাব) নিলেই হল। কামকাঞ্চনত্যাগী হয়েও শতকরা নিরেনব্বই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হয়ে পড়ে। Fame—that last infirmity of noble mind (যশাকাঙ্ক্ষাই উচ্চান্তঃকরণের শেষ দুর্ব্বলতা) পড়েছিস্ না? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে। ভাল, মন্দ—লোকে দুই ত বল্‌বেই। কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সাম্‌নে রেখে আমাদের সিঙ্গির মত কাজ করে যেতে হবে; তাতে, "নিন্দন্তু নীতি-নিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু" (পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা বা স্তুতি যাহাই করুক।)

শিষ্য। আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত?

স্বামিজী। মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ কর্‌তে হবে। দেখ্‌না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নেই—মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান্! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত কর্‌তে হবে। ঐরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (কৃতী হবার একমাত্র গূঢ়োপায়); "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (অবলম্বন কর্‌বার আর দ্বিতীয় পথ নেই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবা-ভাব অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসংত্রাসী সিংহবিক্রম।

রামের হিতার্থে জীবনপাত কর্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভে পর্য্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ-পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল করতাল বাজিয়ে, লম্ফ ঝম্প করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একেত এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে—গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাবি, দেখ্‌বি, খোল্ করতালই বাজ্‌ছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমান্‌ষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে, দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুল্‌তে হবে, 'মহাবীর' 'মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত কর্‌তে হবে। যে সব musicএ (গীত-বাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাব-সমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে, ধ্রুপদ গান

শুন্‌তে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার কর্‌তে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্‌তে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শের অনুসরণ) কর্‌লে, তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এ ভাবে চরিত্র গঠন কর্‌তে পারিস, তা হলে তোর দেখা-দেখি হাজার লোক ঐরূপ কর্‌তে শিখ্‌বে। কিন্তু দেখিস, ideal (ঐ আদর্শ) থেকে কখন যেন এক পাও হটিস নি! কখন হীন সাহস হবি নি। খেতে শুতে পর্‌তে, গাইতে বাজাতে, ভোগে রোগে, কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে ত মহাশক্তির কৃপা হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীন সাহস হইয়া পড়ি।

স্বামিজী। তখন এরূপ ভাব্‌বি—"আমি কার সন্তান?—তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি—হীনসাহস!" হীন বুদ্ধি, হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে, "আমি বীর্য্যবান্—আমি মেধাবান্—আমি ব্রহ্মবিৎ—আমি প্রজ্ঞাবান্" বল্‌তে বল্‌তে দাঁড়িয়ে উঠ্‌বি। 'আমি অমুকের চেলা—কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী' এইরূপ অভিমান খুব রাখ্‌বি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভিতর ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস নি? তিনি বল্‌তেন, "এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।" এইরূপ অভিমান সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। তা হলে

আর হীনবুদ্ধি—হীনসাহস নিকটে আস্‌বে না। কখনও মনে দুর্ব্বলতা আস্‌তে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখ্‌বি সব দুর্ব্বলতা—সব কাপুরুষতা তখনি চলে যাবে।

ঐরূপ বলিতে বলিতে স্বামিজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন; অদ্যও সেখানে আসিয়া পশ্চিমাস্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনও ফুটিয়া বাহির হইতেছে! উপবিষ্ট হইয়াই তিনি শিষ্যকে উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা করে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়—ধিক্ তাদের। করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে?—এই—এই!"

এমন হৃদয়স্পর্শী-ভাবে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে"!—সহসা গভীরধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামিজী "এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম" বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে, স্বামিজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।" স্বামী প্রেমানন্দের তবে

চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার "আমি আমার" রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্য্যে গমন করিল।

সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। স্বামিজীর কৃপা ও শক্তিবলে তাহার চঞ্চল মনও সেদিন অনুভূতি রাজ্যের অতি সন্নিকটে গমন করিয়াছিল! এই ঘটনার সাক্ষিরূপে বেলুড়মঠের সন্ন্যাসিগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্বামিজীর সেদিনকার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া, উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি সকলের মন যেন সমাধির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

সেই শুভদিনের অনুধ্যান করিয়া শিষ্য এখনও আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে হয়—পূজ্যপাদ আচার্য্যের কৃপায় ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করা তাহার ভাগ্যেও এক দিন ঘটিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামিজী বেড়াইতে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ্‌লি, আজ কেমন হল? সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এরা ঠাকুরের সন্তান কিনা, বলবামাত্র এদের তখনি তখনি অনুভূতি হয়ে গেল।"

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের মত লোকের মনও যখন নির্ব্বিষয় হইয়া গিয়াছিল, তখন ওঁদের কা কথা। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল! এখন কিন্তু ঐ ভাবের আর কিছুই মনে নাই—যেন স্বপ্নবৎ হইয়া গিয়াছে।

স্বামিজী। সব কালে হয়ে যাবে। এখন কাজ কর। এই মহামোহগ্রস্ত জীবসমূহের কল্যাণের জন্য কোন কাজে

লেগে যা। দেখ্‌বি ওসব আপ্‌নি আপ্‌নি হয়ে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, অত কর্ম্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়—সে সামর্থ্যও নাই। শাস্ত্রেও বলে, "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।"

স্বামিজী। তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য। আপনার মত সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শীর সঙ্গে বাস ও তত্ত্ববিচার করিব; আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এ শরীরেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিব। এ ছাড়া কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয়, যেন অন্য কিছু করিবার সামর্থ্যও আমাতে নাই।

স্বামিজী। ভাল লাগে ত তাই করে যা। আর, তোর সব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত লোকদেরও জানিয়ে দে, তা হলেই অনেকের উপকার হবে। শরীর যতদিন আছে, ততদিন কাজ না করে ত কেউ থাক্‌তে পারে না। সুতরাং যে কাজে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত। তোর নিজের অনুভূতি এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবাক্যে অনেক বিবিদিষুর উপকার হতে পারে। ঐ সব লিপিবদ্ধ করে যা। এতে অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য। অগ্রে আমারই অনুভূতি হউক, তখন লিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে, "চাপ্‌রাস্‌ না পেলে, কেহ কাহারও কথা লয় না।"

স্বামিজী। তুই যে সব সাধনা ও বিচারের stage (অবস্থা) দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিস্‌, জগতে এমন লোক অনেক থাক্‌তে পারে, যারা ঐ stageএ (অবস্থায়) পড়ে

আছে ; ঐ অবস্থা পার হয়ে অগ্রসর হতে পার্‌ছে না। তোর experience (অনুভূতি) ও বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ হলে, তাদেরও ত উপকার হবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে যে সব "চর্চ্চা" করিস্, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখ্‌লে, অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য। আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিব।

স্বামিজী। যে সাধন ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না—মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না—কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হতে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি ? তুই বুঝি মনে করিস্, একটি জীবের বন্ধন থাক্‌তে তোর মুক্তি আছে ? যত কালে—যত জন্মে তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে—তাকে সাহায্য কর্‌তে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব তোরই অঙ্গ। এইজন্যই পরার্থে কর্ম্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করিস্, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান্ হবে, তখন বুঝ্‌ব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন—not a moment before (এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও নহে), জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হলে, তবে বুঝ্‌ব—তুই ideal এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস্।

শিষ্য। এটি ত মহাশয় ভয়ানক কথা—সকলের মুক্তি না হইলে

ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও ত এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি নাই!

স্বামিজী। এক class (শ্রেণীর) বেদান্তবাদীদের ঐরূপ মত আছে—তাঁরা বলেন, "ব্যষ্টিগত মুক্তি—মুক্তির যথার্থ স্বরূপ নহে। সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি।" অবশ্য, ঐ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখান যেতে পারে।

শিষ্য। বেদান্ত মতে ব্যষ্টিভাবই ত বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসত্তাই কাম্যকর্ম্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন। বিচারবলে উপাধিশূন্য হইলে—নির্ব্বিষয় হইলে—প্রত্যক্ষ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে কিরূপে? যাহার জীবজগতাদি বোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—সকলের মুক্তি না হইলে, তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাদি-বলে মন নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই বা কোথায়, আর জগতই বা কোথায়?—কিছুই থাকে না। তাহার মুক্তিত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।

স্বামিজী। হাঁ, তুই যা বলছিস্, তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দ্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু যে মনে করে, আমি আব্রহ্ম জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হব, তার মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ্‌ দেখি।

শিষ্য। মহাশয়, উহা উদারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

স্বামিজী শিষ্যের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্য মনে কোন বিষয় ইতিপূর্ব্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আমাদের কি কথা হচ্ছিল ?" যেন পূর্ব্বের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ! শিষ্য ঐ বিষয়ের স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় স্বামিজী বলিলেন, "দিনরাত ব্রহ্ম বিষয়ের অনুধ্যান করবি। একান্তমনে ধ্যান করবি। আর ব্যুত্থানকালে হয় কোন লোক-হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করবি—না হয় মনে মনে ভাববি,—'জীবের—জগতের উপকার হোক্'—'সকলের দৃষ্টি ব্রহ্মাবগাহী হোক্', ঐরূপ ধারাবাহিক চিন্তা তরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন সদনুষ্ঠানই নিরর্থক হয় না, তা উহা কার্য্যই হোক—আর চিন্তাই হোক্। তোর চিন্তাতরঙ্গের প্রভাবে হয় ত আমেরিকার কোন লোকের চৈতন্য হবে।"

শিষ্য। মহাশয়, আমার মন যাহাতে যথার্থ নির্ব্বিষয় হয়, তদ্বিষয়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুণ—এই জন্মে যেন তাহা হয়।

স্বামিজী। তা হবে বই কি। ঐকান্তিক থাকলে নিশ্চয় হবে।

শিষ্য। আপনি মনকে ঐকান্তিক করিয়া দিতে পারেন ; আপনার সে শক্তি আছে, আমি জানি। আমাকে ঐরূপ করিয়া দিন্, ইহাই প্রার্থনা।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে শিষ্যসহ স্বামিজী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দশমীর চন্দ্রে মঠের উদ্যান যেন রজতধারায় প্লাবিত হইতেছিল। শিষ্য উল্লসিত-প্রাণে স্বামিজীর পশ্চাতে পশ্চাতে মঠ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। স্বামিজী উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

সপ্তদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

মঠ সম্বন্ধে নৈষ্ঠিক হিন্দুদিগের পূর্ব্বধারণা—মঠে ৺দুর্গোৎসব ও ঐ ধারণার নিবৃত্তি—নিজ জননীর সহিত স্বামিজীর ৺কালীঘাট দর্শন ও ঐ স্থানের উদার ভাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ—স্বামিজীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেবদেবীর পূজা করাটা ভাবিবার বিষয়—মহাপুরুষ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রহ করেন—দেবদেবীর পূজা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলে স্বামিজী কখনই ঐরূপ করিতেন না—স্বামিজীর ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এ যুগে আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলেই দেশের ও জীবের ধ্রুবকল্যাণ।

বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামিজী কর্ত্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার নিষ্ঠা সর্ব্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্যাভোজ্যাদির বাচ-বিচার নাই —প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্য্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চল্‌তি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে এবং এমন কি, সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসা অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামিজীর অমলধবল

চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিষ্য সময়ে সময়ে ঐরূপ সমালোচনা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাহার মুখে স্বামিজী কখন কখন ঐ সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেন, "হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুন্‌কো দুর্ভাব নহি, যব নিন্দে সংসার।" কখনও বলিতেন, "দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।" আবার কখনও বলিতেন, "Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।" সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামিজী তাঁহার নবভাব প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন—কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না—বা তাঁহার পদাশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, "ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফল্‌বে।" স্বামিজীর শ্রীমুখে একথাও সর্ব্বদাই শুনা যাইত, "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

হিন্দুসমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামিজীর লীলাবসানের পূর্ব্বে কিরূপে অন্তর্হিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ হইতেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে কি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে আসিয়াছে। স্বামিজী শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেন, "ওরে, একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' শীগ্‌গীর আমার জন্য নিয়ে আস্‌বি।"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন?

স্বামিজী। কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন—প্রাচীন স্মৃতিসকল সংগ্রহ করে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ত তাঁর অনুশাসনেই আজকাল চল্‌ছে। তবে তৎকৃত হিন্দুজীবনের গর্ভাধান হতে শ্মশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রস্রাবে—খেতে-শুতে—অন্য সকল বিষয়ের ত কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বদ্ধ কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে সে বন্ধন বহুকালস্থায়ী হতে পার্‌লে না। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, ক্রিয়াকাণ্ড—সমাজের আচার-প্রণালী সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্ত্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখ্‌তে পাবি ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্য্যন্তও একভাবে রয়েছে। তবে তার interpreters (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে—এইমাত্র।

শিষ্য। আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন?

স্বামিজী। এবার মঠে দুর্গোৎসব কর্‌বার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি খরচার সঙ্কুলন হয়, ত মহামায়ার পূজো করব। তাই দুর্গোৎসব-বিধি পড়্‌বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই আগামী রবিবারে

যখন আস্‌বি, তখন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ করে নিয়ে আস্‌বি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

পর রবিবারে শিষ্য রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব ক্রয় করিয়া স্বামিজীর জন্য মঠে লইয়া আসিল, গ্রন্থখানি আজিও মঠের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে? স্বামিজী পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই খুসী হইলেন এবং ঐ দিন হইতে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ দিনেই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিষ্যের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেন, "তোর দেওয়া রঘুনন্দনের স্মৃতিখানি সব পড়ে ফেলেছি। যদি পারি ত এবার মার পূজো করব। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দ্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় ত তাও করব।"

শিষ্যের সহিত স্বামিজীর উপরোক্ত কথাগুলি ৺পূজার তিন চারি মাস পূর্ব্বে হয়। পরে ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথাই মঠের কাহারও সহিত কহেন নাই। কিন্তু তাঁহার ঐ সময়ের চালচলন দেখিয়া শিষ্যের মনে হইত যে, তিনি ঐ সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবেন নাই। পূজার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মঠে যে প্রতিমা আনয়ন করিয়া এ বৎসর পূজা হইবে, একথার কোন আলোচনা বা পূজা সম্বন্ধে কোন আয়োজন শিষ্য মঠে দেখিতে পায় নাই। স্বামিজীর জনৈক গুরুভ্রাতা ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্নে দেখেন যে মা দশভুজা গঙ্গার উপর দিয়া দক্ষিণেশ্বর দিক হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন! পরদিন প্রাতে স্বামিজী মঠের সকলের নিকট পূজা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে, তিনিও তাঁহার

নিকট স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীও তাহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যেরূপে হোক, এবারে মঠে পূজো করতেই হবে।" তখন পূজা করা স্থির হইল এবং ঐ দিনই একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া স্বামিজী, স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল বাগ্‌বাজারে চলিয়া আসিলেন ; অভিপ্রায়—বাগবাজারে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করা এবং তাঁহারই নামে সঙ্কল্প করিয়া ঐ পূজা সম্পন্ন হইবে, ইহা জ্ঞাপন করা। কারণ, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের কোনরূপ পূজা বা ক্রিয়া "সঙ্কল্প" করিয়া, করিবার অধিকার নাই।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বীকৃতা হইলেন এবং মঠের পূজা তাঁহারই নামে "সঙ্কল্পিত" হইবে, স্থির হইল। স্বামিজীও ঐজন্য বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ঐ দিনেই কুমারটুলীতে প্রতিমার বায়না দিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামিজীর পূজা করিবার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ ঐ কথা শুনিয়া উহার আয়োজনে আনন্দে যোগদান করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপরে পূজোপকরণ সংগ্রহের ভার পড়িল। কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী পূজক হইবেন স্থির হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব সাধকাগ্রণী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারক পদে ব্রতী হইলেন। মঠে আনন্দ ধরে না! যে জমিতে এখন ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব হয়, সেই জমির উত্তর ধারে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। ষষ্ঠীর বোধনের দুই এক দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল, নির্ভয়ানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নৌকা করিয়া মায়ের

প্রতিমা মঠে লইয়া আসিলেন। ঠাকুরঘরে নীচের তলায় মায়ের মূর্ত্তিখানি আনিয়া রাখিবামাত্র, যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। মায়ের প্রতিমা নির্ব্বিঘ্নে মঠে পৌঁছিয়াছে, এখন জল হইলেও কোন ক্ষতি নাই—ভাবিয়া, স্বামিজী নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের যত্নে মঠ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ—পূজোপকরণেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই—দেখিয়া, স্বামিজী স্বামী-ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের বাগানবাটীখানি—যাহা পূর্ব্বে নীলাম্বরবাবুর ছিল, একমাসের জন্য ভাড়া করিয়া পূজার পূর্ব্বদিন হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সান্ধ্যপূজা স্বামিজীর সমাধি-মন্দির এখন যেথানে অবস্থিত তাহার সম্মুখস্থ বিল্বমূলে সম্পন্ন হইল। তিনি ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া পূর্ব্বে একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন, "বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন" ইত্যাদি, তাহা এতদিনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর আদেশে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্ব্বাহিত হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়া মঠে পশুবলিদান হইল না। বলির অনুকল্পে চিনির নৈবেদ্য ও স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয়পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিল।

গরীব দুঃখী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বেলুড়, বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ববিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী।

সে যাহাই হউক, মহাসমারোহে দিনত্রয়ব্যাপী মহোৎসব-কল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তানতরঙ্গ গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক-ঢোলের রুদ্রতালে কলনাদিনী ভাগীরথী নৃত্য করিতে লাগিল। "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্"—কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্ন্যাসিগণের মুখে ঐ তিন দিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে পূজায় সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বয়ং উপস্থিত, যাহা স্বামিজীর সঙ্কল্পিত, দেহধারী দেবসদৃশ মহাপুরুষগণ যাহার কার্য্যসম্পাদক, সে পূজা যে অচ্ছিদ্র হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! দিনত্রয়-ব্যাপী পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। গরীব দুঃখীর ভোজন-তৃপ্তিসূচক কলরবে মঠ তিন দিন পরিপূর্ণ হইল।

মহাষ্টমীর পূর্ব্বরাত্রে স্বামিজীর জ্বর হইয়াছিল। সে জন্য তিনি পর দিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু সন্ধিক্ষণে উঠিয়া জবাবিল্বদলে মহামায়ার শ্রীচরণে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নবমীর দিন তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবমীরাত্রে যে সকল গান

গাহিতেন, তাহার দুই একটি স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন। মঠে সে রাত্রে আনন্দের তুফান বহিয়াছিল।

নবমীর দিন পূজাশেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা যজ্ঞ দক্ষিণান্ত করা হইল। যজ্ঞের ফোঁটা ধারণ এবং সঙ্কল্পিত পূজা সমাধা করিয়া স্বামিজীর মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জ্জন করা হইল এবং তৎপরদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও স্বামিজীপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্ব্বাবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

দুর্গোৎসবের পর স্বামিজী মঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্যামা-পূজাও প্রতিমা আনাইয়া ঐ বৎসর যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহিত করেন। ঐ পূজাতেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারক এবং কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ছিলেন।

শ্যামাপূজান্তে স্বামিজীর জননী মঠে একদিন বলিয়া পাঠান যে, বহুপূর্ব্বে স্বামিজীর বাল্যকালে তিনি এক সময়ে "মানত" করিয়াছিলেন যে, একদিন স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে গিয়া মহামায়ার পূজা দিবেন, উহা পূর্ণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্বামিজী অগ্রহায়ন মাসের শেষভাগে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলেও, একদিন কালীঘাটে গিয়াছিলেন। ঐদিনে কালীঘাটে পূজা দিয়া মঠে ফিরিয়া আসিবার সময়ে শিষ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং কি ভাবে তথায় পূজাদি দেন, তাহা শিষ্যকে বলিতে বলিতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহাই এক্ষনে এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

সপ্তদশ বল্লী

ছেলেবেলায় স্বামিজীর একবার বড় অসুখ করে। তখন তাঁহার জননী "মানত" করেন যে, পুত্র আরোগ্যলাভ করিলে কালীঘাটে তাহাকে লইয়া যাইয়া মায়ের বিশেষ পূজা দিবেন ও শ্রীমন্দিরে তাহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া লইয়া আসিবেন। ঐ "মানতের" কথা এতকাল কাহারও মনে ছিল না। ইদানীং স্বামিজীর শরীর অসুস্থ হওয়ায়, তাঁহার গর্ভধারিণীর ঐ কথা স্মরণ হয় এবং তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া কালীঘাটে লইয়া যান। কালীঘাটে যাইয়া স্বামিজী কালী-গঙ্গায় স্নান করিয়া জননীর আদেশে আর্দ্র-বস্ত্রে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রী৺কালী-মাতার পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তৎপরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। অমিত-বলবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর সেই যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে মায়ের মন্দিরে সেদিন খুব ভিড় হইয়াছিল। শিষ্যের বন্ধু, কালীঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি শিষ্যের সঙ্গে বহুবার স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞ স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুনঃপুনঃ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সে দিন স্বামিজী দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন বলিয়া গিরীন্দ্রবাবু ঐ ঘটনা আজও বর্ণন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ঘটনাটি শিষ্যকে পূর্ব্বোক্তভাবে শুনাইয়া স্বামিজী পরিশেষে বলিলেন, "কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখ্‌লুম; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত 'বিবেকানন্দ' বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে কোন বাধাই

দেন নি, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা পূজো করতে সাহায্য করেছিলেন।”

এইরূপে জীবনের শেষভাগেও স্বামিজী হিন্দুর অনুমেয় পূজা-পদ্ধতির প্রতি আন্তরিক ও বাহ্য বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এই পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহাদিগের বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয়। “আমি শাস্ত্রমর্য্যাদা নষ্ট করিতে আসি নাই—পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি”—“I have come to fulfil and not to destroy”—উক্তিটির সফলতা স্বামিজী ঐরূপে নিজ জীবনে বহুধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকেশরী শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত নির্ঘোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেব দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই—ভক্তি প্রণোদিত হইয়া নানা স্তব স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন, স্বামিজীও তদ্রূপ সত্য ও কর্ত্তব্য বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানসকলের [illegible] হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, লোক-কল্যাণ-কামনায়, সাধনায় ও জিতেন্দ্রিয়তায় স্বামিজীর তুল্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ বর্ত্তমান শতাব্দীতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী ইহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমরা ধন্য ও মুগ্ধ হইয়াছি বলিয়াই, এই শঙ্করোপম মহাপুরুষকে বুঝিবার ও তদাদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতের যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, সহৃদয়তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে

কামদেব, সাহসে অর্জ্জুন এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাসতুল্য স্বামিজীর সম্পূর্ণতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন শ্রীস্বামিজীর জীবনই যে বর্ত্তমান যুগে আদর্শরূপে একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মহাসমন্বয়াচার্য্যের সর্ব্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যার তমোনাশী কিরণজালে সসাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ, পূর্ব্বাকাশে এই তরুণারুণচ্ছটা দর্শন করিয়া জাগরিত হও, নবজীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভব কর।

অষ্টাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

ঠাকুরের জন্মোৎসব ভবিষ্যতে কি ভাবে হইলে ভাল হয়—শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ, 'যখন এখানে এসেছিস্, তখন নিশ্চয় জ্ঞানলাভ হবে'—গুরু শিষ্যকে কতকটা সাহায্য করিতে পারেন—অবতার পুরুষেরা এক দণ্ডে জীবের সমস্ত বন্ধন ঘুচাইয়া দিতে সক্ষম—কৃপা—শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরকে দেখা—পওহারী বাবা ও স্বামিজী-সংবাদ।

আজ ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের) মহামহোৎসব—যে উৎসব স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ) শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। এই উৎসবের পরের আষাঢ় মাসের ২০শে তারিখে রাত্রি ৯টা আন্দাজ, তিনি স্বরূপ সম্বরণ করিয়াছিলেন। উৎসবের কিছু পূর্ব্ব হইতে স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেশী কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব রচনা করিয়া উহা ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই, স্বামি-পাদ-পদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামিজী মেজেতে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই, স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিল এবং আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। স্বামিজী শিষ্য-রচিত স্তবটি পড়িতে আরম্ভ করিবার

পূর্ব্বে তাহাকে বলিলেন, "খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা ভারী টাটিয়েছে।" শিষ্য তদনুরূপ করিতে লাগিল।

স্তব-পাঠান্তে স্বামিজী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "বেশ হয়েছে।"

হায়! শিষ্য সে সময় জানে না যে, তার রচনার প্রশংসা স্বামিজী আর এ শরীরে করিবেন না।

স্বামিজীর শারীরিক অস্বস্থাবস্থা এতদূর বাড়িয়াছে দেখিয়া, শিষ্যের মুখ ম্লান হইল এবং বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

স্বামিজী শিষ্যের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কি ভাবছিস্? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে (প্রবিষ্ট করাতে) পেরে থাকি, তা হলেই জান্‌ব দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে।"

শিষ্য। আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? নিজগুণে দয়া করিয়া যাহা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে হয়।

স্বামিজী। সর্ব্বদা মনে রাখিস্, ত্যাগই হচ্ছে—মূল মন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে, ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার শ্রীমুখ হইতে ঐ কথা নিত্য শুনিয়া এত দিনেও উহা ধারণা হইল না, সংসারাসক্তি গেল না, ইহা কি কম পরিতাপের কথা! আশ্রিত দীন সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে শীঘ্র উহা প্রাণে প্রাণে ধারণা হয়।

স্বামিজী। ত্যাগ নিশ্চয় আস্‌বে, তবে কি জানিস্?—"কালেনাত্মনি

বিন্দতি”—সময় না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগ্-জন্ম-সংস্কার কেটে গেলেই, ত্যাগ ফুটে বেরোবে।

কথাগুলি শুনিয়া শিষ্য অতি কাতরভাবে স্বামিজীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, “মহাশয়, এ দীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপদ্মে আশ্রয় দেন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে থাকিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও আমার ইচ্ছা হয় না।”

স্বামিজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে হইল, তিনি যেন দূর-দৃষ্টি-চক্রবালে তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “লোকের গুলতোন্ (উৎসবের লোক-সমাগম) দেখে কি আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্। আর, নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে বসিয়ে দে—কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।” শিষ্য দৌড়িয়া গিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামিজীর আদেশ জানাইল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দও সকল কার্য্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগ্ড়ি বাঁধিয়া ও হাতে লাঠি লইয়া, স্বামিজীর ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

অনন্তর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিষ্য পুনরায় স্বামিজীর কাছে আসিল। মনের সাধে আজ স্বামিজীর সেবা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আজ আনন্দে উৎফুল্ল! স্বামিজীর পদসেবা করিতে করিতে সে বালকের ন্যায় যত মনের কথা স্বামিজীকে খুলিয়া বলিতে লাগিল, স্বামিজীও হাস্যমুখে তৎকৃত প্রশ্নাদির উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল।

স্বামিজী। আমার মনে হয়, এরূপ ভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অন্যভাবে হয় ত বেশ হয়। একদিন নয়, চার পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। ১ম দিন—হয়ত শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হল। ২য় দিন—হয়ত বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল। ৩য় দিন—হয়ত Question Class (প্রশ্নোত্তর) হল। তার পর দিন—চাই কি Lecture (বক্তৃতা) হল। শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয় তেমনি হল। দুর্গাপূজা যেমন চার দিন ধরে হয়—তেম্‌নি। ঐরূপে উৎসব কর্‌লে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আস্‌তে পার্‌বে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুল্‌তোন হলেই যে ঠাকুরের মত খুব প্রচার হল, তা ত নয়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার উহা সুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।

স্বামিজী। আর বাবা, ওসব কর্‌তে মন যায় না। এখন থেকে তোরা ওসব করিস্‌।

শিষ্য। মহাশয়, এবার অনেক দল কীর্ত্তন আসিয়াছে।

ঐ কথা শুনিয়া স্বামিজী উহা দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সমাগত অগণ্য ভক্ত-মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ দেখিয়াই আবার বসিলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া শিষ্য তাঁহার মস্তকে আস্তে আস্তে ব্যজন করিতে লাগিল।

স্বামিজী। তোরা হচ্ছিস্ ঠাকুরের লীলার Actors (অভিনেতা)। এর পরে—আমাদের কথা ত ছেড়েই দে—তোদেরও লোকে নাম কর্‌বে। এই যে সব স্তব লিখছিস্, এর পর লোকে ভক্তি মুক্তি লাভের জন্য এই সব স্তব পাঠ কর্‌বে। জান্‌বি, আত্মজ্ঞান লাভই পরম সাধন। অবতার-পুরুষরূপী জগদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি হলে ঐ জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে বেরোবে।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল।

শিষ্য। মহাশয়, আমার ঐ জ্ঞানলাভ হইবে ত ?

স্বামিজী। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে তোর জ্ঞান-ভক্তি হবে। কিন্তু সংসারাশ্রমে তোর বিশেষ কোন সুখ হবে না।

শিষ্য স্বামিজীর ঐ কথায় বিষণ্ণ হইল এবং স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইবে, ভাবিতে লাগিল।

শিষ্য। আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলা কাটিয়া দেন তবেই উপায়; নতুবা এ দাসের উপায়ান্তর নাই! আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন—যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই।

স্বামিজী। ভয় কি ? যখন এখানে এসে পড়েছিস্, তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে।

শিষ্য স্বামিজীর পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "এবার আমায় উদ্ধার করিতে হইবেই হইবে।"

স্বামিজী। কে কার উদ্ধার কর্‌তে পারে বল্? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারে। ঐ আবরণগুলো

গেলেই, আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জ্যোতিষ্মান্ হয়ে সূর্য্যের মত প্রকাশ পান।

শিষ্য। তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুনতে পাই কেন?

স্বামিজী। কৃপা মানে কি জানিস্? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) করে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত radius (ব্যাসার্দ্ধ) লয়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circle এর (বৃত্তের) ভেতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধন-ভজন না করেও তারা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস্ ত বল।

শিষ্য। এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা নাই কি মহাশয়?

স্বামিজী। তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত, মুমুক্ষু-পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মুক্ত করে দেওয়া কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা। বুঝ্লি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপায় কি?

স্বামিজী। তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়—ঠিক এমনি আমাদের মত শরীর দেখতে পায় ও তাঁর কৃপা পায়।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন কি ?

স্বামিজী। ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে ঐ সময় আমি থাকতুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান বল্‌ত। কিন্তু আমার তাতে ভয় হত না; জানিস্ ত আমি ব্রহ্মদৈত্য, ভূত-ফুতের ভয় বড় রাখিনি। ঐ বাগানে অনেক নেবু-গাছ, বিস্তর ফল্‌ত। আমার তখন অত্যন্ত পেটের অসুখ, আবার তার ওপর সেখানে রুটী ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা মিল্‌ত না। কাজেই হজমের জন্য খুব নেবু খেতুম। পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত করে, তাঁকে খুব ভাল লাগল। তিনিও আমায় খুব ভালবাস্‌তে লাগলেন। একদিন মনে হল, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় কর্‌বার কোন উপায়ই ত পাই নি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। এঁর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় করে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন কর্‌ব। জানিস্ ত, আমার বাঙ্গালের মত রোক্। যা মনে কর্‌ব তা কর্‌বই। যে দিন দীক্ষা নেবো মনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে ভাব্‌ছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন,

যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু কর্‌ব—এই কথা মনে হওয়ায়, লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধ হয় ২।৩ ঘণ্টা গত হল; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন। ঠাকুরকে দেখে মন একরকম হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মত দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প স্থগিত রাখ্‌তে হল। দুই এক দিন বাদে, আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সঙ্কল্প উঠল। সে দিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হল—ঠিক আগেকার দিনের মত। এইরূপ উপর্য্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ কর্‌লুম। মনে হল, যখনই মন্ত্র নেব মনে কর্‌ছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হবে না।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কখনও তাঁহার সঙ্গে আপনার কোন কথা হইয়াছিল কি?

স্বামিজী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। খানিক বাদে শিষ্যকে বলিলেন, "ঠাকুরের যারা দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য! 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে পড়েছিস্, তখন তোরা এখানকার লোক। 'রামকৃষ্ণ' নাম ধরে কে যে এসেছিল কেউ চিন্‌লে না। এই যে তাঁর অন্তরঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ—এরাও তাঁর

ঠাওর পায়নি। কেহ কেহ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র। পরে সকলে বুঝবে। এই যে রাখাল টাখাল, যারা তাঁর সঙ্গে এসেছে—এদেরও ভুল হয়ে যায়। অন্যের কথা আর কি বল্‌ব ?"

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় শিষ্য উঠিয়া নিরঞ্জনানন্দ স্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসেছে ?" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর দু চারজন ইংরেজ মহিলা।" শিষ্য স্বামিজীকে ঐ কথা বলায়, স্বামিজী বলিলেন, "ঐ আল্‌খাল্লাটা দে ত।" শিষ্য উহা তাঁহাকে আনিয়া দিলে তিনি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া সভ্য ভব্য হইয়া বসিলেন ও শিষ্য দ্বার খুলিয়া দিল। ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর ইংরেজ মহিলারা প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বসিলেন এবং স্বামিজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্য কথাবার্ত্তার পরেই চলিয়া গেলেন। স্বামিজী শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্‌, এরা কেমন সভ্য ? বাঙ্গালী হলে, আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।" শিষ্য আবার দরজা বন্ধ করিয়া স্বামিজীকে তামাক সাজিয়া দিল।

বেলা প্রায় ২॥০টা। লোকের মহা ভিড় হইয়াছে। মঠের জমিতে তিল-পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্ত্তন, কত প্রসাদ-বিতরণ হইতেছে—তাহার সীমা নাই! স্বামিজী শিষ্যের মন বুঝিয়া বলিলেন, "একবার নয় দেখে আয়—খুব শীগগীর আস্‌বি কিন্তু।" শিষ্যও আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিলেন।

দশ মিনিট আন্দাজ বাদে শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজীকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল।

স্বামিজী। কত লোক হবে?

শিষ্য। পঞ্চাশ হাজার।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামিজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই জনসঙ্ঘ দেখিয়া বলিলেন, "বড় জোর ৩০ হাজার।"

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪॥০ টার সময় স্বামিজীর ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

উনবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

স্বামিজী শেষ জীবনে কি ভাবে মঠে থাকিতেন—তাঁহার দরিদ্রনারায়ণ-সেবা—দেশের গরীব দুঃখীর প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত সহানুভূতি।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী মঠেই অবস্থান করিতেন এবং মঠের গৃহস্থালী কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও কখন কখন কোন কোন কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কখন নিজ হস্তে মঠের জমি কোপাইতেন, কখন গাছপালা ফল-ফুলের বীজ রোপণ করিতে আবার কখন বা চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ায়, ঘর দ্বারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া নিজ হস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঐ সকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া, 'আপনি কেন!'—বলিতেন, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতেন, "তা হলই বা—অপরিষ্কার থাক্‌লে মঠের সকলের যে অসুখ করবে!" ঐ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়াছিলেন। বড় একটা মাদী ছাগলকে "হংসী" বলিয়া ডাকিতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে "মট্‌রু" বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙ্গুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা আদর

পাইয়া স্বামিজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামিজী তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের বালকের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। মঠ দর্শনে নবাগত ব্যক্তিরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া ও তাঁহাকে ঐরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিত, "ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!" কিছুদিন পরে "মট্রু" মরিয়া যাওয়ায়, স্বামিজী বিষণ্নচিত্তে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—"ছাখ, আমি যেটাকেই একটু আদর কর্তে যাই, সেটাই মরে যায়।"

মঠের জমির জঙ্গল সাফ্ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতি বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িয়াছেন যে, স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল ব্যক্তির আগমন-সংবাদ দিলে, তিনি বলিলেন, "আমি এখন দেখা কর্তে পার্ব না, এদের নিয়ে বেশ আছি।" বাস্তবিকই সেদিন স্বামিজী ঐ সকল দীন দুঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্বামিজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখন কখন স্বামিজীকে বলিত, "ওরে স্বামী বাপ্—তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিস্ না—তোর সঙ্গে

কথা বল্‌লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর বুড়ো বাবা এসে বকে।" কথা শুনিয়া, স্বামিজীর চোখ ছল্ ছল্ করিত এবং বলিতেন, "না না, বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বক্‌বে না; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল"—বলিয়া, তাহাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে বলিলেন, "ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা বলিল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ্।" স্বামিজী বলিলেন, "নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে। তা হলে ত খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, 'হাঁরে স্বামী বাপ্—তোরা এমন জিনিষটা কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাইনি।' স্বামিজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, "তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।" স্বামিজী যে দরিদ্র-নারায়ণসেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী শিষ্যকে বলিলেন, "এদের দেখলুম, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত—এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।"

ঊনবিংশ বল্লী

অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর কর্‌তে পার্‌বি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? 'পরহিতায়' সর্ব্বস্ব অর্পণ— এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কখন কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়—মঠ ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এই সব গরীব দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা ত গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পর্‌তে পাচ্ছে না— আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুল্‌ছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম— মাকে কত বল্লুম, 'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্ব্য চূষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ কর্‌ছে!—আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে—মা! তাদের কোন উপায় হবে না'? ওদেশে ধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান কর্‌তে পারি।

"দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া—ফেলে দিই তোর লেখা পড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনা-বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়ি পাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

"আহা, দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবেনা রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাস্ একদিন কাজ বন্ধ কর্‌লে সহরে হাহাকার রব ওঠে—

হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখ্‌না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে—মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান্ হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বল্‌ছি—'ছুঁস্‌নে' 'ছুঁস্‌নে'। দেশে কি আর দয়া ধর্ম্ম আছেরে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার্ ঝাঁটা—মার্ লাথি! ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস্'—বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠ্‌লে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না কর্‌তে পার্‌লুম, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারী কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান কর্‌তে পার্‌ছে না। সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখ্‌ছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্ব্বাঙ্গে, রক্তসঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে, দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাক্‌লেও, ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জান্‌বি।"

শিষ্য। মহাশয়, এদেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম্ম—বিভিন্ন ভাব—ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার।

স্বামিজী। (সক্রোধে) কঠিন বলে কোন কাজটাকে মনে করলে হেথায় আর আসিস্ নি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক্ সোজা হয়ে যায়। তোর কার্য্য হচ্ছে—দীন-দুঃখীর সেবা করা, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে—তার ফল কি হবে না হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে, কার্য্য করে যাওয়া—পরে সব আপনি আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা হচ্ছে—গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙ্গা নয়। জগতের ইতিহাস পড়ে ছ্যাখ্, এক একজন মহাপুরুষ এক একটা সময়ে এক একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের ভাবে অভিভূত হয়ে শত সহস্র লোক জগতের হিত সাধন করে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান্ ছেলে—হেথায় এতদিন আস্‌ছিস্—কি কর্‌লি বল্ দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পার্‌লিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত ফেদান্ত পড়্‌বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা—তবে জান্‌ব—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।

কথাগুলি বলিয়া, স্বামিজী এলো থেলো ভাবে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন, "আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে দয়া করে যেই জন—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।"

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্বামিজী দোতলায় উঠিলেন এবং বিছানায় শুইয়া শিষ্যকে বলিলেন, "পা দুটো একটু টিপে দে।" শিষ্য অদ্যকার কথাবার্ত্তায় ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন সাহস পাইয়া প্রফুল্লমনে স্বামিজীর পদসেবা করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ যা বলেছি, সে সব কথা মনে গেঁথে রাখ্‌বি। ভুলিস্‌নি যেন।"

বিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ (প্রারম্ভ)

বিষয়

বরাহনগর-মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের সাধন ভজন—মঠের প্রথমাবস্থা—স্বামিজীর জীবনের কয়েকটি দুঃখের দিন—সন্ন্যাসের কঠোর শাসন।

আজ শনিবার। শিষ্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঠে আসিয়াছে। মঠে এখন সাধন, ভজন, জপ, তপস্যার খুব ঘটা। স্বামিজী আদেশ করিয়াছেন, কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী, সকলকেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ ধ্যান করিতে হইবে। স্বামিজীর ত নিদ্রা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে, রাত্রি তিনটা হইতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকেন। একটা ঘণ্টা কেনা হইয়াছে—শেষ রাত্রে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইতে ঐ ঘণ্টা মঠের প্রতি ঘরের নিকট সজোরে বাজান হয়।

শিষ্য মঠে আসিয়া স্বামিজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন ভজন হচ্ছে; সকলেই শেষ রাত্রে ও সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ ধরে জপ ধ্যান করে। ঐ দেখ, ঘণ্টা আনা হয়েছে;—ঐ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙ্গান হয়। সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ঘুম থেকে উঠ্‌তে হয়। ঠাকুর

বল্‌তেন, 'সকাল সন্ধ্যায় মন খুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাকে, তখনই একমনে ধ্যান করতে হয়'।

"ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপ ধ্যান করতুম তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেহ চান্ করে, কেহ না করে, ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপ-ধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশই ছিল না। শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাক্‌ত, ও বাড়ীর গিন্নীর মত ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগ-রাগের ও আমাদের খাওয়ান দাওয়ানর যোগাড় ওই সব কর্‌ত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্য্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে হিঁচড়ে আমাদের জপ-ধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি।

শিষ্য। মহাশয়, মঠের খরচ তখন কি করিয়া চলিত?

স্বামিজী। কি করে চল্‌বে কিরে? আমরা ত সাধু সন্ন্যাসী লোক। ভিক্ষাশিক্ষা করে যা আস্‌ত, তাইতেই সব চলে যেত। আজ সুরেশবাবু, বলরামবাবু নেই; তারা দুজন থাক্‌লে এই মঠ দেখে কত আনন্দ কর্‌ত! সুরেশ বাবুর নাম শুনেছিস্ ত? তিনি এই মঠের এক রকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরাহনগরের মঠের সব খরচ-পত্র বহন করতেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবত। তার ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না।

শিষ্য। মহাশয়, শুনিয়াছি মৃত্যুকালে আপনারা তাঁহার সহিত বড় একটা দেখা করিতে যাইতেন না ?

স্বামিজী। যেতে দিলে ত যাব ? যাক্, সে অনেক কথা। তবে এইটে জেনে রাখ্‌বি, সংসারে তুই বাঁচিস্ কি মরিস্, তাতে তোর আত্মীয় পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয় আশয় রেখে যেতে পারিস্ ত তোর মরবার আগেই দেখ্‌তে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি সুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা দেবার কেহ নেই—স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত নয়। এর নামই সংসার !

মঠের পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধে স্বামিজী আবার বলিতে লাগিলেন,—"খরচ পত্রের অনটনের জন্য কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি কর্‌তুম্। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম্ না। শশীকে আমাদের মঠের central figure (কেন্দ্র-স্বরূপ) বলে জান্‌বি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হল ত নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন ভাত চলছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই ; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাস্‌ছি। তেলাকুচো-পাতা সেদ্ধ, নুন ভাত, এই মাসাবধি চলেছে—আহা, সে সব কি দিনই গেছে ! সে কঠোরতা দেখ্‌লে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি ? এ কথাটা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, তোর ভেতরে যদি বস্তু থাকে ত যত circumstances against (অবস্থা প্রতিকূল,) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হবে। তবে এখন যে

মঠে খাট বিছানা, খাওয়া দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার কারণ, আমরা যতটা সইতে পেরেছি, তত কি আর এখ৲ যারা সন্ন্যাসী হতে আসছে, তারা পার্‌বে ? আমরা ঠাকুরে৲ জীবন দেখেছি, তাই দুঃখ কষ্ট বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আন্‌তু৲ না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পার্‌বে না। তা৲ একটু থাক্‌বার জায়গা ও একমুঠো অন্নের বন্দোবস্ত করা- মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে, ছেলেগুলো সাধন ভজনে ম৲ দেবে ও জীবহিতকল্পে জীবনপাত কর্‌তে শিখ্‌বে।"

শিষ্য। মহাশয়, মঠের এ সব খাট বিছানা দেখিয়া বাহিরে৲ লোক কত কি বলে।

স্বামিজী। বল্‌তে দে না। ঠাট্টা করেও ত এখানকার কথা এক-বার মনে আন্‌বে? শত্রুভাবে শীগ্‌গীর মুক্তি হয়। ঠাকুর বল্‌তেন, 'লোক না পোক', এ কি বল্লে, ও কি বল্লে; তাই শুনে বুঝি চল্‌তে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য। মহাশয়, আপনি কখন বলেন, "সব নারায়ণ, দীন-দুঃখী আমার নারায়ণ"; আবার কখন বলেন, "লোক না পোক", ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না।

স্বামিজী। সকলেই যে নারায়ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সকল নারায়ণে ত criticise (নিন্দা) করে না? কৈ, দীন-দুঃখীরা এসে মঠের খাট ফাট দেখে ত criticise (নিন্দা) করে না? সৎকার্য্য করে যাব—যারা criticise কর্‌বে, তাদের দিকে দৃক্‌পাতও কর্‌ব না—এই senseএ (ভাবে) "লোক না পোক" কথা বলা হয়েছে। যার

ঐরূপ রোক্ আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারও কারও বা একটু দেরীতে, এই যা তফাৎ। কিন্তু, হবেই হবে। আমাদের ঐরূপ রোক্ (জিদ্) ছিল, তাই একটু আধটু যা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে-ছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেল তবে হুঁশ হয়েছিল! অন্য এক সময়ে সারাদিন না খেয়ে কলিকাতায় একাজ সেকাজ করে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১ টার সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি—এমন এক দিন নয়!

কথাগুলি বলিয়া, স্বামিজী অন্যমনা হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"ঠিক্ ঠিক্ সন্ন্যাস কি সহজে হয়রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। একটু বেচালে পা পড়্‌লে ত একবারে পাহাড় থেকে খড়ে পড়ল—হাত পা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কাণাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে, দেখে বড়ই তামাক খেতে ইচ্ছে হল! লোকটাকে বল্‌লুম, "ওরে ছিলিম্‌টে দিবি?" সে যেন জড় সড় হয়ে বল্‌লে, "মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হ্যায়।" সংস্কার কিনা?—শুনেই পেছিয়ে এসে, তামাক না খেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগ্‌লুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল,—তাইত, সন্ন্যাস

নিয়েছি; জাত কুল মান—সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম! তার ছোঁয়া তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠ্‌ল, তখন প্রায় একপো পথ এসেছি। আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম; দেখি তখনও লোকটা সেখানে বসে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লুম, —"ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।" তার আপত্তি গ্রাহ্য কর্‌লুম না। বল্লুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে?—অবশেষে তামাক সেজে দিলে। তখন আনন্দে ধূমপান করে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিলে জাতি বর্ণের পারে চলে গেছি কি না, পরীক্ষা করে আপনাকে দেখ্‌তে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাস-ব্রত রক্ষা করা কত কঠিন, কথায় ও কাজে একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নেই।"

শিষ্য। মহাশয়, আপনি কখন গৃহীর আদর্শ এবং কখন ত্যাগীর আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে ধারণ করেন, উহার কোন্‌টি আমাদিগের মত লোকের অবলম্বনীয়?

স্বামিজী। সব শুনে যাবি; তার পর যেটা ভাল লাগে, সেটা ধরে থাক্‌বি—Bull dog এর (ডাল কুত্তার) মত কাম্‌ড়ে ধরে পড়ে থাক্‌বি।

বলিতে বলিতে শিষ্য-সহ স্বামিজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং কখন মধ্যে মধ্যে "শিব শিব" বলিতে বলিতে, আবার কখন বা গুন্ গুন্ করিয়া "কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী" ইত্যাদি গান করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

একবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

বেলুড় মঠে ধ্যান-জপানুষ্ঠান—বিদ্যারূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে আত্মদর্শন—ধ্যানকালে একাগ্র হইবার উপায়—মনের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প অবস্থা—কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের উপায়—ভাব-সাধনার পথে বিপদ—কীর্ত্তনাদির পরে অনেকের পাশব-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি কেন হয়—কিরূপে ধ্যানারম্ভ করিবে—ধ্যানাদির সহিত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ।

শিষ্য গত রাত্রে স্বামিজীর ঘরেই ঘুমাইয়াছে। রাত্রি ৪টার সময় স্বামিজী শিষ্যকে জাগাইয়া বলিলেন, "যা, ঘণ্টা নিয়ে সব সাধু ব্রহ্মচারীদের জাগিয়ে তোল্।" শিষ্য আদেশমত প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। পরে তাঁহারা সজাগ হইয়াছেন দেখিয়া, নীচে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সব সাধু ব্রহ্মচারী-দের তুলিল। সাধুরা তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিয়া, কেহ বা স্নান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া, ঠাকুরঘরে জপ ধ্যান করিতে প্রবেশ করিলেন।

স্বামিজীর নির্দ্দেশমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাণের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজানয় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাঙ্গালের জ্বালায় মঠে থাকা দায় হল।" শিষ্য স্বামিজীকে ঐ কথা বলায়, স্বামিজী খুব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ করেছিস্।"

অতঃপর স্বামিজীও হাতমুখ ধুইয়া শিষ্যসহ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ ঠাকুরঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। স্বামিজীর জন্য পৃথক্ আসন রাখা ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া শিষ্যকে সম্মুখে একখানি আসন দেখাইয়া বলিলেন, "যা, ঐ আসনে বসে ধ্যান কর্।" ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথমে কেহ মন্ত্রজপ, কেহ বা অন্তর্যোগমুখে শান্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। মঠের বায়ুমণ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও অরুণোদয় হয় নাই, আকাশে তারা জ্বলিতেছে।

স্বামিজী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিস্পন্দ হইয়া সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শ্বাস অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামিজীর সেই নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান নির্নিমেষে দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ না স্বামিজী উঠিবেন, ততক্ষণ কাহারও আসন ছাড়িয়া উঠিবার আদেশ নাই! সেজন্য কিছুক্ষণ পরে তাহার পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধরায় উঠিবার ইচ্ছা হইলেও, সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে স্বামিজী "শিব শিব" বলিয়া ধ্যানোত্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু তখন অরুণ-রাগে রঞ্জিত, মুখ গম্ভীর, শান্ত, স্থির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামিজী নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ্‌লি—সাধুরা আজকাল কেমন জপ ধ্যান করে? ধ্যান গভীর হলে, কত কি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বরাহনগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখতে পেয়েছিলুম। একটু চেষ্টা কর্‌লেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সুষুম্নার দর্শন পেলে, যা দেখতে চাইবি তাই দেখতে পাওয়া যায়। দৃঢ়া গুরুভক্তি থাক্‌লে, সাধন, ভজন, ধ্যান, জপ সব আপনা আপনি আসে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।"

অনন্তর শিষ্য তামাক সাজিয়া স্বামিজীর কাছে পুনরায় আসিলে তিনি ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "ভিতরে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ সিঙ্গি (সিংহ) রয়েছেন, ধ্যান-ধারণা করে তাঁর দর্শন পেলেই মায়ার ছুনিয়া উড়ে যায়। সকলের ভেতরেই তিনি সমভাবে আছেন; যে যত সাধন ভজন করে, তার ভেতর কুণ্ডলিনী শক্তি তত শীঘ্র জেগে ওঠেন। ঐ শক্তি মস্তকে উঠ্‌লেই দৃষ্টি খুলে যায়—আত্মদর্শন লাভ হয়।"

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রে ঐ সব কথা পড়িয়াছি মাত্র। প্রত্যক্ষ কিছুই ত এখনও হইল না।

স্বামিজী। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—সময়ে হতেই হবে। তবে কারও শীগ্‌গীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাক্‌তে হয়—নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখ্‌তে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠ্‌ছে, সে গুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখ্‌তে হয়। ঐরূপে দেখ্‌তে

দেখ্‌তেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তাতর থাকে না। ঐ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে—মনের সঙ্কল্পবৃত্তি ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস্, তা একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে ঐগুলি তা মনে ওঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিে যাচ্ছে, ঐগুলি ওঠা বা ধ্যানকালে মনে পড়াই তা প্রমাণ। মন কখন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তি হয়—উহারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ব্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে—তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যক্ চৈতন্যে গলে যায়। উহার নামই বৃত্তিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মুহুর্মুহুঃ প্রত্যক্ষ করেছি। চেষ্টা করে তাঁকে ঐ সকল অবস্থা আন্‌তে হত না। আপনা আপনি সহসা হয়ে যেত। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাঁকে দেখে ত এসব ঠিক বুঝতে পেরেছি। প্রত্যহ একাকী ধ্যান কর্‌বি। সব আপনা আপনি খুলে যাবে। বিদ্যা-রূপিণী মহামায়া ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব জান্‌তে পাচ্ছিস্ না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান কর্‌বার পূর্ব্বে যখন নাড়ীশুদ্ধ কর্‌বি, তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত কর্‌বি আর বল্‌বি, "জাগ মা", "জাগ মা"! ধীরে ধীরে এ সব অভ্যাস করতে হয়। Emotional sideটে (ভাব-প্রবণতা) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটের

বড় ভয়। যারা বড় emotional (ভাবপ্রবণ), তাদের কুণ্ডলিনী ফড়্ ফড়্ করে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠ্‌তেও যতক্ষণ নাব্‌তেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাব-সাধনার সহায় কীর্ত্তন ফীর্ত্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির উর্দ্ধগতি হয় বটে—কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। আমার আমেরিকার বক্তৃতা শুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে মাগী-মিন্‌সেগুলোর মধ্যে অনেকের ভাব হত—কেউ বা জড়বৎ হয়ে যেত। আমি অনুসন্ধানে পরে জান্‌তে পেরেছিলাম, ঐ অবস্থার পরই অনেকের কাম-প্রবৃত্তির আধিক্য হত। স্থির ধ্যান ধারণার অনভ্যাসেই ওরূপ হয়।

শিষ্য। মহাশয়, এ সকল গুহ্য সাধন-রহস্য কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। আজ নূতন কথা শুনিলাম।

স্বামিজী। সব সাধন-রহস্য কি আর শাস্ত্রে আছে?—এগুলি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গুপ্তভাবে চলে আস্‌ছে। খুব সাবধানে ধ্যান ধারণা কর্‌বি। সাম্‌নে সুগন্ধি ফুল রাখ্‌বি, ধুনা জ্বাল্‌বি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ তাই কর্‌বি। গুরু ইষ্টের নাম কর্‌তে কর্‌তে বল্‌বি—জীব জগৎ সকলের মঙ্গল হোক! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অধঃ উর্দ্ধ সব দিকেই শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে

স্ব

[illegible] প্রথম প্রথম করতে হয়। তার [illegible] কোন মুখে বসলেই হল। [illegible] সেইরূপ ধ্যান করবি [illegible] ঝক্কাট থাকে ত [illegible] একটা নিষ্ঠা না [illegible]

এইবার স্বামিজী উপরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন— “তোদের অল্পেই আত্মদৃষ্টি খুলে যাবে। যখন হেথায় এসে পড়েছিস, তখন মুক্তি ফুক্তি ত তোদের করতলে। এখন ধ্যানাদি করা ছাড়া আর্ত্তনাদপূর্ণ সংসারের দুঃখও কিছু দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে যা দেখি। কঠোর সাধনা করে এ দেহ পাত করে ফেলেছি। এই হাড় মাংসের খাঁচায় আর [illegible]ন কিছু নেই। তোরা এখন কাজে লেগে যা, আমি একটু [illegible]ই। আর কিছু না পারিস, এই সব যত শাস্ত্র ফাস্ত্র পড়্‌লি, [illegible] কথা জীবকে শোনাগে। এর চেয়ে আর দান নেই। জ্ঞান-দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।”

দ্বাবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

মঠে কঠোর বিধি-নিয়মের প্রচলন—"আত্মারামের কৌটা" ও উহার শক্তি পরীক্ষা—স্বামিজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে শিষ্যের প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত কথোপকথন—পূর্ব্ববঙ্গে অদ্বৈতবাদ বিস্তার করিতে স্বামিজীর শিষ্যকে উৎসাহিত করা, এবং বিবাহিত হইলেও ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া তাহাকে অভয়দান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে স্বামিজীর বিশ্বাস—নাগ মহাশয়ের সিদ্ধ-সঙ্কল্পত্ব।

স্বামিজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রালোচনার জন্য মঠে প্রতিদিন প্রশ্নোত্তর ক্লাস হইতেছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাসের ভিতর প্রধান জিজ্ঞাসু। ঐরূপে শাস্ত্রালোচনাকে স্বামিজী "চর্চ্চা" শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন এবং "চর্চ্চা" করিতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে সর্ব্বদা বহুধা উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবৎ, কোন দিন বা উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের আলোচনা হইতেছে। স্বামিজীও প্রায় নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। স্বামিজীর আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনি শাস্ত্রালোচনার জন্য ঐ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে। তাঁহার শাসন সর্ব্বথা শিরোধার্য্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্ত্তিত

নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, ধ্যান—সকলই এখন কঠোর-নিয়মবদ্ধ। কাহারও কোন দিন ঐ নিয়মের একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে, নীতিমর্য্যাদাভঙ্গের জন্য সেদিন তাহাকে মঠে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাহাকে সেদিন পল্লী হইতে নিজে ভিক্ষা করিয়া আনিতে হয় এবং ঐ ভিক্ষান্ন মঠভূমিতে নিজেই রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। আবার সংঘগঠনকল্পে স্বামিজীর দূরদৃষ্টি কেবলমাত্র মঠবাসিগণের জন্য কতকগুলি দৈনিক নিয়ম করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় মঠের রীতিনীতি ও কার্য্যপ্রণালীর সম্যগালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত অনুশাসন সকলও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহার পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রত্যহ স্নানান্তে স্বামিজী ঠাকুরঘরে যান, ঠাকুরের চরণামৃত পান করেন, শ্রীপাদুকা মস্তকে স্পর্শ করেন এবং ঠাকুরের ভস্মাস্থিসম্পুটীত কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। এই কৌটাকে তিনি "আত্মারামের কৌটা" বলিয়া অনেক সময় নির্দ্দেশ করিতেন। এই সময়ের অল্পদিন পূর্ব্বে ঐ "আত্মারামের কৌটা"কে লইয়া এক বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয়। একদিন স্বামিজী উহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইতেছেন—এমন সময় সহসা তাঁহার মনে হইল, 'সত্যই কি ইহাতে আত্মারাম ঠাকুরের আবেশ রহিয়াছে? দেখিব পরীক্ষা করিয়া'—ভাবিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর! যদি তুমি রাজধানীতে উপস্থিত অমুক মহারাজকে মঠে তিন দিনের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইস, তবে বুঝিব, তুমি সত্যসত্যই এখানে

আছ।" মনে মনে ঐরূপ বলিয়া, তিনি ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কিছুক্ষণ পরে ঐ কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন তিনি কার্য্যান্তরে কয়েক ঘণ্টার জন্য কলিকাতায় যাইলেন। অপরাহ্নে মঠে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, সত্যসত্যই ঐ মহারাজা মঠের নিকটবর্ত্তী ট্রাঙ্ক্ রোড্ দিয়া যাইতে যাইতে পথে গাড়ী থামাইয়া, স্বামিজীর অন্বেষণে মঠে লোক পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি মঠে উপস্থিত নাই শুনিয়া, মঠ-দর্শনে অগ্রসর হন নাই। সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র স্বামিজীর নিজ সঙ্কল্পের কথা মনে উদয় হইল এবং বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে নিজ গুরুভ্রাতৃগণের নিকট ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তিনি "আত্মারামের কৌটা"কে বিশেষ সন্তর্পণে পূজা করিতে তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন।

আজ শনিবার। শিষ্য বৈকালে মঠে আসিয়াই স্বামিজীর ঐ সিদ্ধসঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়াছে। স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিবামাত্র সে জানিতে পারিল, তিনি তখনই বেড়াইতে বাহির হইবেন, স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। শিষ্যের একান্ত বাসনা, স্বামিজীর সঙ্গে যায় —কিন্তু অনুমতি না পাইলে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া বসিয়া রহিল। স্বামিজী আলখাল্লা ও গৈরিক বসনের কানঢাকা টুপী পরিয়া, একগাছি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন— পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্ব্বে শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চল—যাবি?" শিষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

কি ভাবিতে ভাবিতে স্বামিজী অন্যমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড্ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিষ্য স্বামিজীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া, কথা কহিয়া তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ করিতে সাহসী না হইয়া, প্রেমানন্দ মহারাজের সহিত নানা গল্প করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, ঠাকুর—স্বামিজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কি বলিতেন, তাহাই বলুন।" (স্বামিজী তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন।)

স্বামী প্রেমানন্দ। কত কি বল্‌তেন তা তোকে একদিনে কি বল্‌ব? কখনও বল্‌তেন, "নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে।" কখনও বল্‌তেন, "ও আমার শ্বশুর ঘর।" আবার কখনও বল্‌তেন, "এমনটি জগতে কখনও আসে নাই—আস্‌বে না।" একদিন বলেছিলেন, "মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়!" বাস্তবিকই উনি তখন কোন ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভিতরে করে উঁহাকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় সব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে উনি সব মানলেন।

শিষ্য। আমার সঙ্গে নিত্য কত হাস্য পরিহাস করেন। এখন কিন্তু এমন গম্ভীর হইয়া রহিয়াছেন যে কথা কহিতে ভয় হইতেছে।

প্রেমানন্দ। কি জানিস্?—মহাপুরুষেরা কখন কি ভাবে থাকেন—তা আমাদের মনবুদ্ধির অগোচর। ঠাকুরের

জীবৎকালে দেখেছি, নরেনকে দূরে দেখে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন; যাদের ছোঁয়া জিনিষ খাওয়া উচিত নয় বলে অন্য সকলকে খেতে নিষেধ করতেন, নরেন তাদের ছোঁয়া খেলেও কিছু বল্‌তেন না। কখনও বল্‌তেন, "মা, ওর অদ্বৈতজ্ঞান চাপা দিয়ে রাখ—আমার ঢের কাজ আছে।" এসব কথা কেই বা বুঝবে—আর কাকেই বা বল্‌ব?

শিষ্য। মহাশয়, বাস্তবিকই কখন কখন মনে হয়, উনি মানুষ নহেন। কিন্তু—আবার কথাবার্ত্তা, যুক্তি-বিচার করিবার কালে মানুষ বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয়, যেন কোন আবরণ দিয়ে সে সময় উনি আপনার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে দেন না।

প্রেমানন্দ। ঠাকুর বল্‌তেন, "ও যখনি জান্‌তে পারবে—ও কে, তখনি আর এখানে থাক্‌বে না, চলে যাবে।" তাই কাজকর্ম্মের ভেতরে নরেনের মনটা থাক্‌লে, আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যান ধারণা কর্‌তে দেখ্‌লে আমাদের ভয় হয়।

এইবার স্বামিজী মঠাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিষ্যকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কিরে তোদের কি কথা হচ্ছিল?" শিষ্য বলিল, "এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধীয় নানা কথা হইতেছিল।" উত্তর শুনিয়াই স্বামিজী আবার অন্যমনে পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় যে ক্যাম্পখাটখানি

কালে আরও কত আস্‌বে। ঠাকুর বল্‌তেন, "যে একদিনের জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে তাকে এখানে আস্‌তেই হবে।" যারা সব এখানে রয়েছে, তারা এক একজন মহাসিংহ; আমার কাছে কুঁচ্‌কে থাকে বলে এদের সামান্য মানুষ বলে মনে করিস্‌ নি। এরাই আবার যখন বাহির হবে তখন এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের শরীরের অংশ বলে এদের জান্‌বি। আমি এদের ঐ ভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল রয়েছে, ওর মত Spirituality (ধর্ম্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে বলে ওকে কোলে কর্‌তেন, খাওয়াতেন—একত্র শয়ন কর্‌তেন। ও আমাদের মঠের শোভা—আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, সুবোধ প্রভৃতির মত ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখ্‌তে পাবি কি না সন্দেহ। এরা প্রত্যেকে ধর্ম্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মত। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ হবে।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল; স্বামিজী আবার বলিলেন, "তোদের দেশ থেকে নাগ মশায় ছাড়া কিন্তু আর কেউ এল না। আর দু একজন যারা ঠাকুরকে দেখেছিল—তারা তাঁকে ধরতে পাল্লে না।" নাগ মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া স্বামিজী কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া রহিলেন। স্বামিজী শুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে গঙ্গার উৎস

উঠিয়াছিল। সেই কথাটি স্মরণ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "হাঁরে, ঐ ঘটনাটা কিরূপ বল্ দিকি ?"

শিষ্য। আমিও ঐ ঘটনা শুনিয়াছি মাত্র—চক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার মহাবারুণী যোগে পিতাকে সঙ্গে করিয়া নাগ মহাশয় কলিকাতা আসিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু লোকের ভিড়ে গাড়ী না পাইয়া তিন চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। অগত্যা নাগ মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন ও পিতাকে বলেন, "মন শুদ্ধ হলে মা গঙ্গা এখানেই আস্‌বেন।" পরে যোগের সময় বাড়ীর উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস উঠিয়াছিল,—এইরূপ শুনিয়াছি। যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। আমার তাঁহার সঙ্গলাভের বহু পূর্ব্বে ঐ ঘটনা ঘটয়াছিল।

স্বামিজী। তার আর আশ্চর্য্য কি ? তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষ; তাঁর জন্য ঐরূপ হওয়া আমি কিছু আশ্চর্য্য মনে করি না।

বলিতে বলিতে স্বামিজী পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন।

তদ্দর্শনে শিষ্য প্রসাদ পাইতে উঠিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ বল্লী

স্থান—কলিকাতা হইতে মঠে নৌকাযোগে

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

স্বামিজীর নিরভিমানিতা—কামকাঞ্চনের সেবা ত্যাগ না করিলে ঠাকুরকে ঠিকঠিক বুঝা অসম্ভব—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত কাহারা—সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী ভক্তেরাই সর্ব্বকাল জগতে অবতার মহাপুরুষদিগের ভাব প্রচার করিয়াছেন—গৃহী ভক্তেরা ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাও আংশিক ভাবে সত্য—মহান্ ঠাকুরের একবিন্দু ভাব ধারণ করিতে পারিলে মানুষ ধন্য হয়—সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে ঠাকুরের বিশেষভাবে উপদেশ দান—কালে সমগ্র পৃথিবী ঠাকুরের উদারভাব গ্রহণ করিবে—ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সাধুদের সেবা বন্দনা মানবের কল্যাণকর।

শিষ্য আজ বৈকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল, কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহীরি-টোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিষ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নন—তাহারই গুরু, স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ।—স্বামিজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙ্গায় চানাচুর ভাজা; বালকের মত উহা খাইতে খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। ভুবনবিখ্যাত স্বামিজীকে ঐরূপে পথে চানাচুর ভাজা খাইতে খাইতে আগমন করিতে দেখিয়া, শিষ্য অবাক্ হইয়া তাঁহার নিরভিমানিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

পরে তিনি সম্মুখস্থ হইলে, শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

স্বামিজী। একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্, তুই মঠে যাবি? চারটি চানাচুর ভাজা খা না? বেশ নুন ঝাল আছে।

শিষ্য হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল ও মঠে যাইতে স্বীকৃত হইল।

স্বামিজী। তবে একখানা নৌকা ত্যাখ্।

শিষ্য দৌড়িয়া নৌকা ভাড়া করিতে ছুটিল। ভাড়া লইয়া মাঝিদের সহিত দর দস্তর চলিতেছে, এমন সময় স্বামিজীও তথায় আসিয়া পড়িলেন। মাঝি মঠে পৌঁছাইয়া দিতে আট আনা চাহিল। শিষ্য দুই আনা বলিল। "ওদের সঙ্গে আবার কি দর দস্তর কচ্ছিস্?" বলিয়া স্বামিজী শিষ্যকে নিরস্ত করিলেন এবং মাঝিকে "যাঃ, আট আনাই দিব"—বলিয়া নৌকায় উঠিলেন। ভাটার প্রবল টানে নৌকা অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে পৌঁছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামিজীকে একাকী পাইয়া, শিষ্য তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার বেশ সুযোগ লাভ করিল। এই বৎসরের (১৩০৯) ২০শে আষাঢ়েই স্বামিজী স্বরূপ সংবরণ করেন। ঐ দিনে গঙ্গাবক্ষে স্বামিজীর সহিত শিষ্যের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই অদ্য পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

ঠাকুরের বিগত জন্মোৎসবে শিষ্য তাঁহার ভক্তদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে স্তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়া স্বামিজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তোর রচিত স্তবে

যাদের যাদের নাম করেছিস্, কি করে জান্‌লি তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ ?

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন যাতায়াত করিতেছি ; তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি ইহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত।

স্বামিজী। ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে, কিন্তু সকল ভক্তেরা ত তাঁর (ঠাকুরের) সাঙ্গোপাঙ্গের ভেতর নয় ? ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আমাদের বলেছিলেন, "মা দেখাইয়া দিলেন, এরা সকলেই এখানকার (আমার) অন্তরঙ্গ লোক নয়।" স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভক্তদের সম্বন্ধেই ঠাকুর সেদিন ঐরূপ বলেছিলেন।

অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতেন, সেই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী ক্রমে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যে যে কতদূর প্রভেদ বর্ত্তমান তাহাই শিষ্যকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

স্বামিজী। কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও করবে—আর ঠাকুরকেও বুঝবে—এ কি কখনও হয়েছে ?—না, হতে পারে ? ও কথা কখনও বিশ্বাস করবিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর অনেকে এখন "ঈশ্বরকোটি" "অন্তরঙ্গ" ইত্যাদি বলে আপনাদের প্রচার করছে। তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য কিছুই নিতে পাল্লে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত। ওসব কথা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর "বাদসা", তাঁর কৃপা পেয়ে কি কেউ

কখন কাম-কাঞ্চনের সেবায় জীবন যাপন কর্‌তে পারে ?

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন ?

স্বামিজী। তা কে বল্‌ছে ? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে Spiritualityর (ধর্ম্মানুভূতির) দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিস্?—সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। // ঠাকুর বল্‌তেন, "অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহ ধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান্ কার্য্য করেন বা জগতে ধর্ম্মভাব প্রচার করেন।" এটা জেনে রাখ্‌বি—অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই যাঁরা পরার্থে সর্ব্বত্যাগী—যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করে "জগদ্ধিতায়" "জীবহিতায়" জীবনপাত করেন। // ভগবান্ ঈশার শিষ্যেরা সকলেই সন্ন্যাসী। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করে আস্‌ছেন। কোথায়, কবে শুনেছিস্—কামকাঞ্চনের দাস হয়ে থেকে মানুষ, মানুষকে উদ্ধার করতে বা ঈশ্বর লাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে ? আপনি মুক্ত না

হলে অপরকে কি করে মুক্ত করবে? বেদ বেদান্ত ইতিহাস পুরাণ সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাবি—সন্ন্যাসীরাই সর্ব্ব-কালে সর্ব্বদেশে লোকগুরুরূপে ধর্ম্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। History repeats itself—যথা পূর্ব্বং তথা পরম্— এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়াচার্য্য ঠাকুরের কৃতী সন্ন্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্ব্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্যের কথা ফাঁকা আওয়াজের মত শূন্যে লয় হয়ে যাবে। মঠের যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণই ধর্ম্মভাব রক্ষা ও প্রচারের মহাকেন্দ্র স্বরূপ হবে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছেন, সে সব কি সত্য নয়?

স্বামিজী। একেবারে সত্য নয় বলা যায় না; তবে, তারা ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলে, তা সব partial truth (আংশিক সত্য)। যে যেমন আধার, সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে তাই আলোচনা কর্‌ছে। ঐরূপ করাটা মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেহ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বল্‌ছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ বল্‌ছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেহ বল্‌ছেন—চৈতন্যদেব 'নারদীয় ভক্তি' প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেহ বল্‌ছেন—সাধন ভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেহ বল্‌ছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত

নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুন্‌বি—ও সব কথায় কান দিবিনি। তিনি যে কি—কত কত পূর্ব্বগ-অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্যা করেও একচুল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বল্‌তে হয়। যে যেমন আধার, তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু ধারণা করতে পেলে, মানুষ তখনি দেবতা হয়ে যায়। সর্ব্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়?—এই থেকেই বোঝ্‌ তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বল্‌লে, তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারদিক খুঁজে দেখ্‌তেন কোন গেরস্ত সেখানে আস্‌ছে কি না। যদি দেখ্‌তেন—কেহ নেই বা আস্‌ছে না, তবেই জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগতপস্যার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই ত আমরা সংসারত্যাগী উদাসীন।

শিষ্য। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রভেদ রাখিতেন?

স্বামিজী। তা তাঁর গৃহী ভক্তদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখিস্ না। বুঝেই দ্যাখ্‌ না কেন—তাঁর যে সব সন্তান ঈশ্বরলাভের জন্য ঐহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে পাহাড়ে পর্ব্বতে, তীর্থে আশ্রমে, তপস্যায় দেহপাত কর্‌ছে, তারা

বড়—না, যারা তাঁর সেবা, বন্দনা, স্মরণ, মনন কচ্ছে, অথচ সংসারের মায়া মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছে না, তারা বড় ? যারা আত্মজ্ঞানে জীবসেবায় জীবনপাত কর্‌তে অগ্রসর, যারা আকুমার ঊর্দ্ধরেতা, যারা ত্যাগবৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান চলদ্বিগ্রহ, তারা বড়—না, যারা মাছির মত একবার ফুলে বসে পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায় বস্‌ছে, তারা বড় ?—এসব নিজেই বুঝে গ্যাখ্‌।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যাঁহারা তাঁহার (ঠাকুরের) কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের আবার সংসার কি ? তাঁহারা গৃহে থাকুন বা সন্ন্যাস অবলম্বন করুন, উভয়ই সমান, আমার এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

স্বামিজী। //তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন, বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার test (পরীক্ষা) কিন্তু হচ্ছে—কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করে নাই। //

পূর্ব্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিষ্য অন্য কথার অবতারণা করিয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি যে দেশ বিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন ইহার ফল কি হইল ?"

স্বামিজী। কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখ্‌তে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।

ত্রয়োবিংশ বল্লী

শিষ্য। আপনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার মুখে শুনিতে বড় ভাল লাগে।

স্বামিজী। এই ত কত কি দিনরাত শুন্‌ছিস্। তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে?

শিষ্য। মহাশয়, আমরা ত তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপায়?

স্বামিজী। তাঁর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত এই সব সাধুদের সঙ্গলাভ ত করেছিস্, তবে আর তাঁকে দেখ্‌লিনি কি করে বল্? তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে বিরাজ কর্‌ছেন। তাঁদের সেবা বন্দনা কর্‌লে, কালে তিনি revealed (প্রকাশিত) হবেন। কালে সব দেখ্‌তে পাবি।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্য সকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেন, সে কথা ত কোন দিন কিছু বলেন না?

স্বামিজী। আমার কথা আর কি বল্‌ব? দেখ্‌ছিস্ ত—আমি তাঁর দৈত্যদানার ভিতরকার একটা কেউ হব। তাঁর সামনেই কখন কখন তাঁকে গালমন্দ কর্‌তুম্। তিনি শুনে হাসতেন।

বলিতে বলিতে স্বামিজীর মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর হইল। গঙ্গার দিকে শূন্যমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌঁছিল। স্বামিজী তখন আপন মনে গান ধরিয়াছেন—

"(কেবল) আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।"—ইত্যাদি

গান শুনিয়া শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামিজীর মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

গান সমাপ্ত হইলে স্বামিজী বলিলেন, "তোদের বাঙ্গাল-দেশে সুকণ্ঠ গায়ক জন্মায় না। মা গঙ্গার জল পেটে না গেলে সুকণ্ঠ হয় না।"

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামিজী নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং জামা খুলিয়া মঠের পশ্চিম বারান্দায় উপবিষ্ট হইলেন। স্বামিজীর গৌরকান্তি এবং গৈরিক বসন সন্ধ্যার দীপালোকে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

চতুর্ব্বিংশ বল্লী

শেষ দেখা

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

জাতীয় আহার, পোষাক ও আচার পরিত্যাগ দূষণীয়—বিদ্যা সকলের কিট হইতে শিখিতে পারা যায়, কিন্তু যে বিদ্যাশিক্ষায় জাতীয়ত্ব লোপ পায়, াহার সর্ব্বথা পরিহার কর্ত্তব্য—পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শিষ্যের সহিত কথোপকথন—মিজীর নিকট শিষ্যের ধ্যানৈকাগ্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা—স্বামিজীর শিষ্যকে শীর্ব্বাদ করা—বিদায়।

আজ ১৩ই আষাঢ়। শিষ্য বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠ আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্ম্মস্থান। অদ্য সে াফিসের পোষাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্ত্তন করিবার ায় পায় নাই। আসিয়াই স্বামিজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামিজী বলিলেন—শ আছি। (শিষ্যের পোষাক দেখিয়া) তুই কোট প্যাণ্ট রস্—কলার পরিস্ নি কেন?" ঐ কথা বলিয়াই নিকটস্থ মী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার যে সব কলার ছে, তা থেকে দুটো কলার একে কাল (প্রাতে) দিস্" সারদানন্দ স্বামীও স্বামিজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লেন।

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্য এক গৃহে উক্ত পোষাক ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া স্বামিজীর কাছে আসিল। স্বামিজী তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ কর্‌লে, ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখ্‌তে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়।"

শিষ্য। মহাশয়, আফিস অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোষাকাদি না পরিলে চলে না।

স্বামিজী। তা কে বারণ কর্‌ছে? আফিস অঞ্চলে কার্য্যানুরোধে ঐরূপ পোষক পরবি বৈ কি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙ্গালী বাবু হবি। সেই কোঁচা ঝুলান, কামিজ গায়, চাদর কাঁধে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামিজী। তোরা কেবল সার্ট (কামিজ) পরেই এবাড়ী ওবাড়ী যাস্—ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ঐরূপ পোষাক পরে লোকের বাড়ী যাওয়া ভারী অভদ্রতা—naked (নেংটো) বলে। সার্টের উপর কোট না পর্‌লে, ভদ্রলোকে বাড়ী ঢুকতেই দেবে না। পোষাকের ব্যাপারে তোরা কি ছাই অনুকরণ কর্‌তেই শিখেছিস! আজকালকার ছেলে-ছোক্‌রারা যে সব পোষাক পরে, তা না এদেশী—না ওদেশী, এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর স্বামিজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র শিষ্যই রহিল। শিষ্য সাধন

সম্বন্ধে একটি কথা এখন স্বামিজীকে বলিবে কি না, ভাবিতে লাগিল।

স্বামিজী। কি ভাব্‌ছিস্? বলেই ফেল না। (যেন মনের কথা টের পাইয়াছেন !)

শিষ্য সলজ্জভাবে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে, আপনি যদি এমন একটা কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন, যাহাতে খুব শীঘ্র মন স্থির হইয়া পড়ে—যাহাতে খুব শীঘ্র ধ্যানস্থ হইতে পারি—তবে খুব উপকার হয়। সংসারচক্রে পড়িয়া সাধন ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার।"

স্বামিজী শিষ্যের ঐরূপ দীনতা দর্শনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন বোধ হইল। প্রত্যুত্তরে তিনি শিষ্যকে সস্নেহে বলিলেন, —"খানিক বাদে আমি উপরে যখন একা থাক্‌ব, তখন তুই যাস্। ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া, স্বামিজীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। স্বামিজী "থাক্ থাক্" বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী উপরে চলিয়া যাইলেন।

শিষ্য ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈত মতের বাগ্‌বিতণ্ডায় ঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলযোগ দেখিয়া শিবানন্দ হারাজ তাহাদের বলিলেন, "ওরে, আস্তে আস্তে বিচার কর্; মন চীৎকার কর্‌লে স্বামিজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।" শিষ্য কথা শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে ামিজীর কাছে চলিল।

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল, স্বামিজী পশ্চিমাস্তে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। মুখ অপূর্ব্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে স্থির—'যেন "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।" স্বামিজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও, স্বামিজীর বাহ্য হুঁশের কোন চিহ্ন না দেখিয়া, নিঃশব্দে ঐ স্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে, স্বামিজীর ব্যবহারিক রাজ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ সাত মিনিট বাদেই স্বামিজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কখন্ এখানে এলি?"

শিষ্য। এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

স্বামিজী। তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বামিজীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কুঁজো হইতে জল লইয়া আসিল। স্বামিজী একটু জল পান করিয়া গ্লাসটি শিষ্যকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন। শিষ্য ঐরূপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামিজীর কাছে বসিল।

স্বামিজী। আজ খুব ধ্যান জমেছিল।

শিষ্য। মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে ঐরূপ ডুবিয়া যায়, তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।

স্বামিজী। তোকে সব উপায় ত পূর্ব্বেই বলে দিয়েছি, প্রত্যহ সেই প্রকার ধ্যান কর্‌বি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল দেখি, তোর কি ভাল লাগে?